দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য— পৃঃ ৩৫

স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা হয়ে উঠেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা — পৃঃ ৩৮

৭২ বর্ষ, ৭ সংখ্যা।। ২১ অক্টোবর ২০১৯।। ৩ কার্তিক - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। দীপাবলী বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

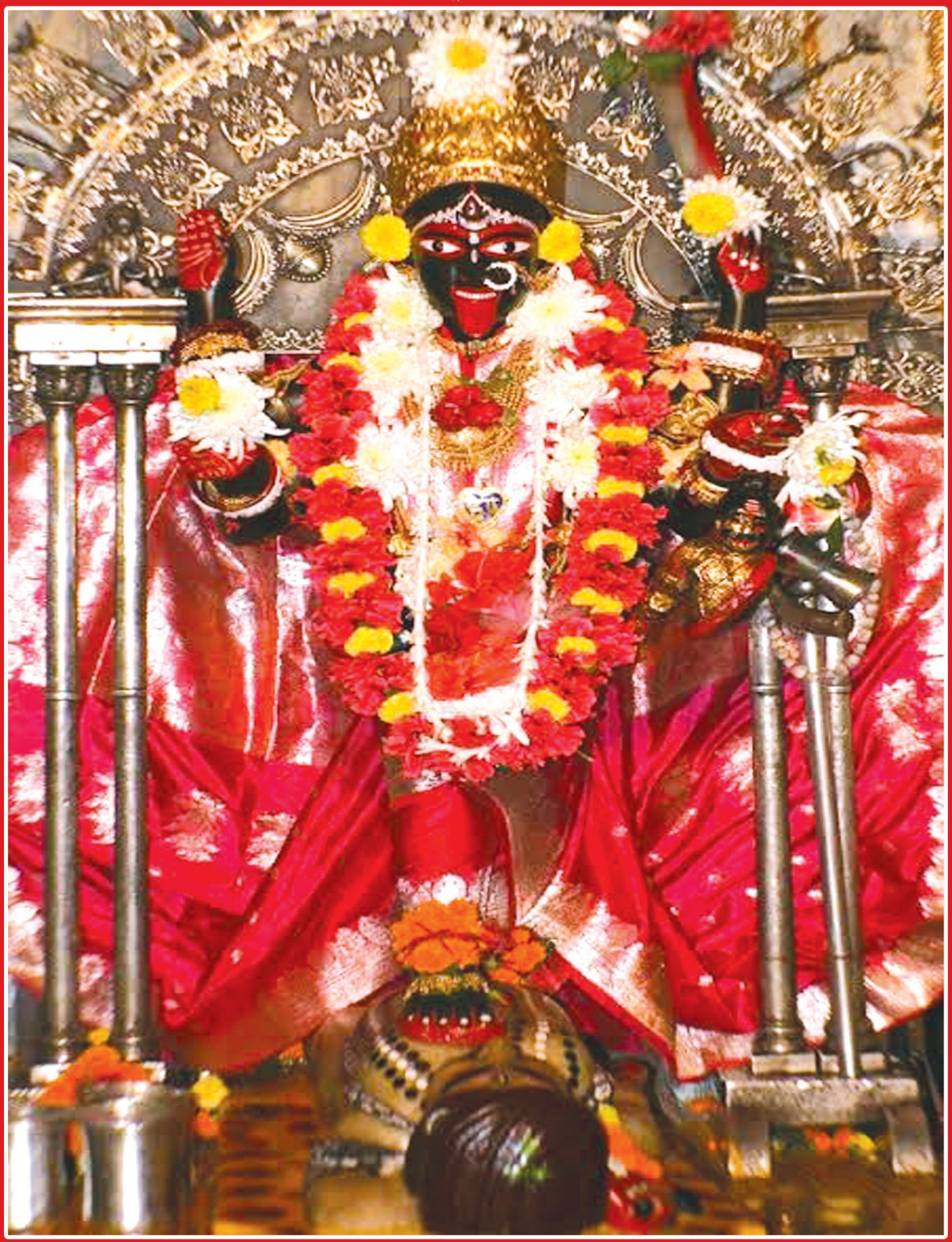

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

দীপাবলী বিশেষ সংখ্যা

৭২ বর্ষ ৭ সংখ্যা, ৩ কার্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

২১ অক্টোবর - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফ ঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

এক বিদেশিনীর ভারত আত্মার সন্ধান
▯ ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৬

খোলা চিঠি : রাজনাথের রাফাল পুজো কষ্ট দিল
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

দেশের অটোমোবাইল ক্ষেত্রের শ্লথগতি অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকারক ▯ রীতেশ কুমার সিংহ ▯ ৮

কাশ্মীর সমস্যা দ্বিপাক্ষিক নয়, ভারতের একান্ত নিজস্ব ও অভ্যন্তরীণ বিষয় ▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১১

ভারতের জাতীয়তা ও হিন্দুত্ব অভিন্ন ▯ অমিত চক্রবর্তী ▯ ১৩

রাষ্ট্রের চিরস্থায়ী সাফল্য অর্জনের জন্য সমস্ত দেশবাসীকে সচেতন হতে হবে ▯ মোহনরাও ভাগবত ▯ ১৫

শ্যামপুকুরের মা ভবতারিণী ▯ সপ্তর্ষি ঘোষ ▯ ২৩

রামপ্রসাদের গানে মা কালী জীবন্ত হয়ে উঠতেন
▯ অরুণ মুখোপাধ্যায় ▯ ২৪

কালীক্ষেত্র কলকাতা ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ২৭

মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসে শিখগুরু পরম্পরা পুণ্য পবিত্র ও চিরস্মরণীয় ▯ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ▯ ৩১

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য
▯ রবিরঞ্জন সেন ▯ ৩৫

স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা হয়ে উঠেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা ▯ সারদা সরকার ▯ ৩৮

পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু বাঙ্গালির স্বাভাবিক বাসভূমি
▯ সঞ্জয় সোম ▯ ৪৩

শাসকদলের রাজনীতি আর প্রশাসনিক চাপে বাংলা সংবাদ মাধ্যমগুলির নাভিশ্বাস ▯ সুজিত রায় ▯ ৪৬

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩০**

সাপ্তাহিক রাশিফল : ৪৯

স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই শুভ বিজয়া ও দীপাবলীর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

—সম্পাদক, স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৮ সেপ্টেম্বর
২০১৯

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৮ সেপ্টেম্বর
২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

১২৫ বছরে বিভূতিভূষণ

জীবনানন্দের কবিতার ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন চিত্ররূপময়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্যভাষ্যকেও কি ওই একই অভিধায় অভিহিত করা যায় না? বিশেষ করে, বিভূতিভূষণের মহাকাব্যিক সৃষ্টি পথের পাঁচালীর ভাষা যে অনেক ক্ষেত্রেই গদ্যের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে কবিতার সীমানায় পা রেখেছে সে ব্যাপারে সন্দেহ করা চলে না। এ বছর বিভূতিভূষণ ১২৫ বছরে পদার্পণ করলেন। স্বস্তিকার পরবর্তী সংখ্যা তাঁকে নিয়ে। বাঙ্গলার পল্লীজীবনের অমর পাঁচালীকারের পুনর্মূল্যায়ন করবেন ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, অভিজিত দাশগুপ্ত, অভিমন্যু গুহ প্রমুখ।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank - Kolkata
Branch : **Shakespeare Sarani**

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জয় কর এই তামসীরে

উপনিষদে বারংবার অন্ধকার হইতে আলোয় উত্তীর্ণ হইবার বাসনা প্রকাশিত হইয়াছে। তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ—উপনিষদের এই বাণীর ভিতরই লুক্কায়িত রহিয়াছে অন্ধকার হইতে আলোয় উত্তীর্ণ হইবার সেই বাসনা। এই অন্ধকার শুধুমাত্র বাহ্যিক অন্ধকার নহে। উপনিষদ চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া মনের অন্ধকারকে দূর করিবার কথাই বলিয়াছে। বাঙ্গলার কবিও বলিয়াছেন, 'জয় কর এই তামসীরে।' এই তামসীকে জয় করিবার বার্তাই হেমন্তিকায় ধ্বনিত হইয়াছে কবির ভাবনায়। বলিয়াছেন, 'দীপালিকায় জ্বালাও আলো, আপন আলো...।' কার্তিকের দীপাবলি এই আলোরই উৎসব। অন্তরের তমসা দূর করিয়া জ্ঞানের আলোকে নিজেকে উদ্ভাসিত করিবার যেমন উৎসব, তেমনই চতুর্দিকে হিংসা, হানাহানি, কুটিলতার যে বাতাবরণ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকে জয় করিয়া নূতন আলোয় নূতন ভোরের বার্তা লইয়া আসিবারও উৎসব। এইবারের দীপাবলিতে তাই আমাদের প্রার্থনা জানাইতেই হইবে—হে জগন্মাতা, হে শক্তিদায়িনী, অশুভের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের শক্তি দাও। রুদ্র যেন আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন। আমরা যেন এই তমসা ঘুচাইয়া জ্ঞান ও শক্তির দীপালোকে এই জগৎকে উজ্জ্বল করিতে পারি।

আমাদের এই রাজ্যটির দিকে তাকাইলেই বুঝা যায়, কোন অন্ধকারের ভিতর আমরা দিনযাপন করিতেছি। কী গভীর সংকটের ভিতর আমরা কালাতিপাত করিতেছি তাহাও বুঝা যায়। এইবার মাতৃপূজার উৎসবের আলো ম্লান হইয়াছে জিয়াগঞ্জে শিক্ষক বন্ধুপ্রকাশ পাল ও তাঁহার পরিবারকে হত্যার ঘটনায়। সাম্প্রতিককালে এত নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় নাই। আততায়ীরা বন্ধুপ্রকাশ এবং তাঁহার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে তো হত্যা করিয়াছেই, উপরন্তু তাহাদের ছয় বৎসরের পুত্রসন্তানটিকেও তাহারা রেহাই দেয় নাই। শুধু এই একটি ঘটনা নহে। পূজার দিনগুলিতেই এই বাঙ্গলায় বিরোধী রাজনৈতিক দলের বেশ কয়েকজন কর্মী শাসক দলের হামলাকারীদের হস্তে নিহত হইয়াছেন। বেশ কিছু পূজা মণ্ডপ এবং প্রতিমা মৌলবাদীরা ভাঙচুর করিয়াছে। কোনো কোনো পূজা মণ্ডপে তো আজানের ধ্বনি বাজাইয়া হিন্দুদের ধর্মীয় আবেগে আঘাত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এই সমস্ত ঘটনায় রাজ্য প্রশাসন অত্যন্ত নিস্পৃহ এবং নির্বিকার ভূমিকা পালন করিয়াছে। জিয়াগঞ্জ বা অন্য কোনো ঘটনাতেই হত্যাকারীদের ধরিবার বিন্দুমাত্র সদিচ্ছা প্রশাসনের ভিতর পরিলক্ষিত হয় নাই। উপরন্তু, রাজ্যে যখন একের পর এক এইসব দুঃখজনক ঘটনা ঘটিতেছে, তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রেড রোডে কার্নিভালে মজিয়া রহিয়াছেন। এই রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে তলানিতে পৌঁছাইয়াছে এবং এক চূড়ান্ত মাৎস্যন্যায় বিরাজ করিতেছে সমগ্র রাজ্যে—এইসব ঘটনা তাহারই প্রমাণ।

রাজ্যটিকে এইরূপ ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইতে দেওয়া চলিবে না। এই অনাচার, অত্যাচার এবং মাৎস্যন্যায় দূর করিয়া আমাদের প্রিয় বঙ্গভূমিকে আবার শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবেই। যে আসুরিক শক্তি এই রাজ্যটিকে এখন শাসন করিতেছে, তাহাকে পরাস্ত করিবার সেই শক্তিই প্রার্থনা করিতে হইবে এইবার দীপাবলির শুভক্ষণে। কার্তিকের অমাবস্যায় বাঙ্গালির গৃহে শক্তিরূপিণী মা কালিকা পূজিতা হন। অসুর নিধন করিয়া শক্তিরূপিণী কালিকা করালবদনা হইয়াছেন। রক্তে তাহার ওষ্ঠ রঞ্জিত। হস্তে খেটক-খর্পর। আলুলায়িত কেশ। সেই শক্তিরূপিণীর নিকট আজ আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতে হইবে। ভয়কে জয় করিবার আশীর্বাদ, অশুভকে নাশ করিবার আশীর্বাদ। তাহা হইলেই দীপাবলি প্রকৃত অর্থে আলোর উৎসব হইয়া উঠিবে এই বঙ্গভূমির বুকে।

সুভাষিতম্

দুর্জনেন সমং সখ্যং বৈরং চাপি ন কারয়েৎ।
উষ্ণো দহতি চাঙ্গারঃ শীতঃ কৃষ্ণায়তে করম্।।

দুর্জনের সঙ্গে মিত্রতা অথবা বন্ধুত্ব করা কখনো উচিত নয়। কেননা তা কয়লার মতো উষ্ণ অবস্থায় হাতকে দহন করে এবং শীতল অবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ করে।

এক বিদেশিনীর ভারতাত্মার সন্ধান

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

এই ভারতেই বেশ কিছু মানুষ আছেন যারা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক নন এবং ধর্মে হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও এদের মধ্যে অনেকেই হিন্দু ধর্মের সমালোচনায় মুখর থাকেন অথচ এই ধর্ম নিয়ে কোনও চর্চা এরা করেন না। অন্যদিকে জাতিগত ভাবে ভারতীয় বা হিন্দু না হয়েও বহু বিদেশী হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বিশদ ভাবে জানতে ইচ্ছুক, তারা হিন্দুধর্মকে একটি মানবতাবাদী দর্শন বলেই মনে কনে। এমনই একজন বিদেশী হলেন ক্যারোলিনা গোস্বামী যিনি মূলত পোল্যান্ডের মানুষ, বর্তমানে বিবাহসূত্রে ভারতীয়। তাঁর ভারতীয় স্বামী অনুরাগ গোস্বামী একজন সফল ডিজাইনার। ক্যারোলিনা তাঁর স্বামীর সঙ্গে বর্তমানে এ দেশেই বসবাস করেন। হিন্দুধর্মের চর্চায় তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন এবং চেষ্টা করছেন যাতে এই ধর্ম ও দর্শন বহু মানুষের অজ্ঞতা দূর করতে পারে।

ক্যারোলিনা 'ইন্ডিয়া ইন ডিটেলস্' নামে একটি ইউটিউব চ্যানেল তৈরি করেছেন যেখানে বেশ কিছু ভিডিও, কোনোটি পাঁচ মিনিটের, কোনোটি আরও বেশি দৈর্ঘ্যের, নিয়মিত প্রদর্শিত হচ্ছে। দীর্ঘতম ভিডিওটি পঞ্চান্ন মিনিটের, যা কিনা ক্যারোলিনার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল।

সারা পৃথিবীতে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা ছড়িয়ে আছে। কায়েমি স্বার্থের অপপ্রচারও এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। এক্ষেত্রে ক্যারোলিনার উদ্যোগ বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন আবিষ্কারগুলির উপরে তিনি আলোকপাত করেছেন। যে সময় পাশ্চাত্যজগৎ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, সেই সময় ভারত জ্ঞানে বিজ্ঞানে যে ভাবে আলোকপ্রাপ্ত

মতামত

হয়েছিল, যতটা উন্নত হয়েছিল, তার সমকক্ষ পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যম প্রাচীন ভারতের অতি উন্নত সভ্যতার ইতিহাস চিরকালই অবজ্ঞা করে এসেছে। শুধু পাশ্চাত্য কেন, ভারতের অভ্যন্তরেই বহু জ্ঞানীগুণী লোকজন বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত সম্বন্ধে ভুল তথ্য পরিবশেন করে থাকেন।

ভারতীয় সভ্যতার যে সকল বিষয়ে মানুষজন তেমন অবহিত নন, সেই বিষয়গুলি নিয়েই ক্যারোলিনা চর্চা করে চলেছেন। এই দেশ চিরকাল বহির্ভারত থেকে বিপদগ্রস্ত হয়ে চলে আসা আশ্রয়প্রার্থীকে নির্দ্বিধায় আশ্রয় দিয়েছে, এই বিষয়টির উপর তিনি আলোকপাত করেছেন। এ দেশে গোমাতাকে কেন পূজা করা হয়, তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

ক্যারোলিনা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য, এই দুই সংস্কৃতিরই সান্নিধ্যে এসেছেন, যা লিখছেন তা সবই তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে লেখা। তাঁর লেখা 'Why I love India' ভারতের মহান ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা, ভুল ধারণা ও বিকৃত পরিবেশন, এই সবগুলি দূর করা, সংশোধন করাই তাঁর উদ্দেশ্য। পশ্চিমের বুদ্ধিজীবীদের সামনে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে তুলে ধরা সহজ কাজ নয়। এর জন্য যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন যেটা ক্যারোলিনার খুব বেশি পরিমাণেই আছে। ভারতের ঐতিহ্য সম্বন্ধে হিন্দুত্ব সম্বন্ধে কত ভুল ধারণা বিদেশে ছড়িয়ে আছে, তাঁর মনকে যা পীড়িত করে। তাই তাঁর এই উদ্যোগ আমাদের কাছে শিক্ষণীয়।

ক্যারোলিনার করা ভিডিওগুলি অনেক নতুন তথ্য দেয়, আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে অনুপ্রেরণা জোগায়। যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায় এগুলির পরিবেশনায়। কোনও দেশের সংস্কৃতির, আচার আচরণের, রীতিনীতির সমালোচনা করা সহজ, কিন্তু বিরূপ সমালোচনার উপযুক্ত জবাব দেওয়া সহজ কাজ নয়, এই কঠিন কাজটিই ক্যারোলিনা করে চলেছেন নিরলস ভাবে বিদেশিনী হওয়া সত্ত্বেও। যে দেশে অসংখ্য মন্দির যেমন আছে অসংখ্য আই টি সেন্টারও আছে, আধুনিক, তীব্র গতিসম্পন্ন শহর যেমন আছে, ধীরগতির গ্রামাঞ্চলও সারা ভারতব্যাপী বর্তমান। এই সবই তাঁকে মুগ্ধ করেছে। এ দেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করেছে যা অপরিমেয়। তাঁর করা ইউ টিউব চ্যানেলটির ঠিকানা : bit.ly/India-in-details। ক্যারোলিনা গোস্বামীকে আমাদের অভিনন্দন ও সশ্রদ্ধ নমস্কার। ▮

রাজনাথের রাফাল পুজোয় কষ্ট দিল

সকলকে শুভ বিজয়ার প্রণাম। আশা করি আনন্দে কেটেছে পুজো। পুজোর বিরতির পরে এই চিঠিতে বরং পুজোর কথাই হোক।

দুর্গা পুজো মানে শক্তির পুজো। দেবী দুর্গা শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। তাঁর দশ হাতে অস্ত্র। অশুভের নাশ করতেই তাঁর মর্ত্যে আগমন। এটাই হিন্দু সংস্কৃতি। এই পর্যন্ত ঠিক আছে। তা বলে রাফালের পুজো। বিজয়া দশমীর দিনে শস্ত্র পূজন! ভাবা যায়! চন্দ্রযান টু উৎক্ষেপণে তবু পুজো দেওয়া যায়, কারণ সেখানে একটা শুভ যাত্রার বিষয় আছে কিন্তু একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশে কিনা সামরিক অস্ত্রের পুজো হবে!

রাজনাথ সিংহ এইখানেই ব্যতিক্রমী কাজটা করেছেন। তিনি রাফাল যুদ্ধবিমানের গায়ে 'ওম' লিখেছেন, চাকার তলায় লেবু রেখেছেন, বিমানটি শস্ত্রপূজা করেছেন। বামপন্থীরা তো বটেই তাদের পোষ্য সংবাদমাধ্যমেও কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেছে। পুজোর আবহে সেই কান্না সত্যিই অস্বস্তি তৈরি করেছে কানে।

ভাবা যায়! গণতন্ত্র তো রসাতলে যেতে বসেছে। প্যান্ডেলে শক্তি পুজো ঠিক আছে, সেটা তো উৎসব। দেবী দুর্গাকে নিয়ে থিম থিম খেলা যায়। কার্নিভালের নাচোন কোঁদন করা যায়। কিন্তু তাই বলে দেশের অস্ত্রকে পুজো! রাজনাথ সিংহমশাই আপনি দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হতেই পারেন কিন্তু তাই বলে যা খুশি তাই করবেন নাকি! আপনাদের সরকারের হাতে প্রভূত শক্তি তাই বলে অস্ত্র পুজো! একবার কি ভাববেন না এতে বামপন্থীদের কষ্ট হয়। তারা পুজোতেই বিশ্বাস করেন না পুজোর ব্যবসায় যত বিশ্বাস। সেই খানে তাদের আত্মায় কতটা আঘাত লেগেছে একবারটি ভেবে দেখুন। প্লিজ, ভাবুন। জানি, হিন্দু সংস্কৃতি বাদ দিয়ে ভারতকে ভাবা যায় না। কিন্তু কোনও রকমে টিকে থাকা ক্ষয়িষ্ণু বাম বুদ্ধিজীবীদের কথা তা হলে ভাববেন না। বারবার একই কথা বলছি, কারণ ভাবাটা উচিত ছিল। ওনারা যেমন গোপনে তাগা, তাবিজ পরেন তেমন করে আপনারাও গোপনে সারতে পারতেন। কিন্তু সেটা না করে গোটা বিশ্বকে সামনে রেখে সসম্মানে অস্ত্রকে পুজো করেছেন।

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা আপনাদের মনের কথা জানি না, কিন্তু এটা জানি যে রাফাল আমাদের অন্যতম রক্ষক। এও জানি যে, রাফাল বা অন্য যে কোনও সমরাস্ত্র শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, সংখ্যালঘু বামেদেরও রক্ষা করবে। আর যে রক্ষা করে তার পুজোয় আপত্তিটা কোথায় বামপন্থীদের সেটা অবশ্য জানি না। না না, জানি। এতকাল ধরে দেশে সব সমরাস্ত্রেরই পুজো হয়ে এসেছে। যুদ্ধবিমান থেকে যুদ্ধজাহাজ সবই কাজ শুরু করেছে ভারতের সনাতন সংস্কৃতি মেনে পুজোর মধ্য দিয়ে। কিন্তু সেসবই হয়েছে চুপচাপ, প্রথা মেনে। এমন করে কোনও প্রতিরক্ষামন্ত্রী বুক ফুলিয়ে সেই কাজটা করতে পারেননি। সেটাও আবার বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে। তাই রাজনাথ সিংহ সমালোচিত। একই সঙ্গে তাঁর পরিচয়টাও ভাবতে হবে। তিনি বিজেপির সাংসদ। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শচালিত। সুতরাং, তাঁর কাজের খুঁত তো ধরতেই হবে।

রাজনাথ অবশ্য উত্তর এড়িয়ে যাননি। বিতর্ক শুরু হওয়া মাত্রই জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি বেশ করেছেন। কারণ, এটাই ভারতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি।

এতেই রাগে ফুঁসে উঠেছে বামমনস্করা। অতি বাম এবং গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল সংবাদপত্র সম্পাদকীয় কলমে আস্ফালন করে লিখেছে— ''ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের অধিকার ব্যক্তিবিশেষের। রাষ্ট্রের সেই অধিকার থাকিতে পারে কি? ইসরোর কে শিবন যখন মন্দিরে পূজা দিতে যান, তখন তিনি যান ব্যক্তি হিসাবে। ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে নহে। রাজনাথ সিংহ ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে রাফাল বিমান গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন। সেই মুহূর্তে তাঁহার একমাত্র পরিচিতি ছিল, তিনিই ভারতীয় রাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্রের ধর্ম নাই। ফলে, রাজনাথ সিংহ ব্যক্তিগত ভাবে শস্ত্রপূজায় বিশ্বাসী কি না, সেই প্রশ্নটিই এক্ষণে অবান্তর— ভারত নামক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিন্দুধর্মের কোনও প্রথায় বিশ্বাসী হইতে পারে না। ফলে, রাজনাথ সিংহ যাহা করিয়াছেন, তাহা ভারতের চরিত্রানুগ নহে। কিন্তু এখানেই আধিপত্যবাদের মহাত্ম্য। দেশবাসীর মনে আর প্রশ্নগুলি জাগে না। প্রশ্নহীন আনুগত্য অপেক্ষা শাসকের আর কী কাম্য।''

হে ঈশ্বর, ধর্ম আর সংস্কৃতির ফারাক ইহাদের কে বুঝাইবে?

এদেশে শারদীয় উৎসব শুরু হয় খুঁটি পুজোর মাধ্যমে। বামপন্থীদের অট্টালিকাও ওঠে ভিত পুজোর মধ্য দিয়ে। বাকি উদাহরণ আপনারাই ভাবুন। চিঠি লম্বা করব না।

—সুন্দর মৌলিক

দেশের অটোমোবাইল ক্ষেত্রের শ্লথগতি অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকারক

অতিথি কলম

রীতেশ কুমার সিংহ

দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গাড়ি শিল্পের অংশগ্রহণ বেশ কিছুটা নিম্নমুখী। সামগ্রিক জিডিপি-র ঊর্ধ্বগতি স্তিমিত হয়ে পড়ার প্রেক্ষাপটে অনেকেই গাড়ি কেনার বিষয়টি বিবেচনাধীন রেখেছেন। কিন্তু এই শিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে যে অনুসারী শিল্প সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর তার প্রভাব কিন্তু বিরাট। গাড়ি শিল্প ধাক্কা খেলেই টায়ার, রং, স্টিলের মতো শিল্পে প্রত্যক্ষ নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। অজস্র ছোটোখাটো ডাউনস্ট্রিম যেমন যন্ত্রপাতি তৈরি, আসনের রেক্সিনের সঙ্গে বিক্রির খুচরো বিক্রয়কেন্দ্র অর্থাৎ শোরুমগুলির কারবারেও বিপদ সংকেত চলে যাবে।

এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধি ৫ শতাংশে নামার পর গাড়ি শিল্পের এই সংকট অর্থনীতিকে আরও গভীর গাড্ডার দিকে ঠেলতে পারার ক্ষমতা ধরে। উৎপাদকদের জমে থাকা inventory-র কারণে তাদের তরফে বিক্রি ফেরাতে নানা কর কমানো বা নানাবিধ ছাড় চাওয়াটা খুব অস্বাভাবিক নয়।

সম্প্রতি অর্থমন্ত্রীর সব রকমের শিল্পক্ষেত্রেই কর্পোরেট ট্যাক্স কমানোর ঘোষণায় শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষমতা বাড়বে। তবুও জিএসটি-র চড়া হারও বড়ো রকমের 'সেস' বলবৎ থাকায় গাড়ি শিল্পের খুব একটা সুবিধে হচ্ছে না। জিএসটি-র হার কমানোয় গাড়ির চড়া দাম থেকেই যাচ্ছে। এর ফলে চাহিদার ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। ব্যক্তিগত আয়করের হারেও ছাঁটাই না করলে হাতে বাড়তি টাকা থাকার আশা কম, তারপর তো গাড়ি!

জিডিপির হিসেবের সময় তাতে উৎপাদন শিল্পের যে ভাগ থাকে তার মধ্যে আবার গাড়ি শিল্পের ভাগ ৪৯ শতাংশ। এই ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কম নিযুক্ত আছেন প্রায় ৩ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ। সোসাইটি অব ইন্ডিয়ান অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারার্স-এর তথ্য অনুযায়ী ইতিমধ্যে চুক্তিতে কাজ করা শ্রমিকদের মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ লোক কাজ হারিয়েছেন। আরও দশ লক্ষের ভবিষ্যৎও এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে নিরাপদ নয়। কেননা অনেক জায়গায় ডিলাররা দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছেন। চাহিদা না থাকায় যেহেতু বিক্রি আশঙ্কাজনকভাবে কমে এসেছে অনেক ছোটোখাটো যন্ত্রাংশ নির্মাণকারীরা ইতিমধ্যেই কারবার গোটাতে বাধ্য হয়েছে।

গত বছরের তুলনায় এ বছরের টানা দশ মাসে গাড়ি বিক্রি ভয়ংকরভাবে পড়ে গেছে। আগস্টে তা বিপজ্জনকভাবে ৩১.৫৭ শতাংশ কমার মাত্রা ছুঁয়েছে। নিশ্চয়ই, সারা বিশ্বব্যাপীই গাড়ি শিল্পে ভাটার টান। এর মধ্যে ভারতে কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ও এর জন্য দায়ী যেমন কিছু ক্ষতিকারক নিয়ম কানুন। ভারত সরকার বিদেশ থেকে গাড়ি আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা লাগু করে নিশ্চিতভাবে দেশীয় গাড়ি শিল্পকে সংরক্ষণ দিয়েছে যাতে তার বৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু সরকারের নিজস্ব কর আদায় ও সরকারি ব্যয়ের মধ্যে ঘাটতি মেটাতে তারা এই শিল্পটিকে কিছুটা কোষাগার হিসেবে ভাবতে শুরু করে। সামগ্রিক ভাবে জিএসটি বাবদ যে আদায় হয় তার শতকরা ১৫ শতাংশ হয় গাড়ি শিল্প খাতে। গাড়ি বিক্রির ওপর করের হার সর্বোচ্চ ২৮ শতাংশ-এর ওপর সেস রয়েছে। সব মিলিয়ে বিশাল ৫০ শতাংশ মোট কর হার দাঁড়াল। ভারতে ইস্পাত শিল্পকে নিরাপত্তা দেওয়ার একটা বরাবরের প্রবণতা থাকায় তাতে কৃত্রিমভাবে সুবিধে দিতে গাড়ি শিল্পই আদতে মার খায়। কেননা এখানে প্রচুর পরিমাণ ইস্পাত ব্যবহৃত হয়।

বহু রাজ্যে গাড়ির নথিবদ্ধকরণ ও পথচলতি কর বিপুল হারে বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে লোকের গাড়ি পোষা একটা বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অভ্রান্ত সত্য কথাটি বলেছেন মারুতি উদ্যোগের চেয়ারম্যান। এত কিছুর পরও বাকি আছে ইরান থেকে তেল না কেনার সিদ্ধান্ত ও সৌদি আরবের তেল ভাণ্ডারের ওপর আক্রমণের পরিণতিতে তেলের দাম বাড়ার প্রভূত সম্ভাবনার দিকটি। সেটি হবে গাড়ি শিল্পের ক্ষেত্রে গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া।

সরকার বিদ্যুৎচালিত গাড়ির ওপর কর হার ৫ শতাংশে নামিয়ে এনে চিরাচরিত তেলচালিত গাড়ির কর হার অপরিবর্তিত রাখার ফলে উভয়ের মধ্যে ব্যাপক ফারাক দেখা দেবে। এর পরিণতিতে বিদ্যুৎ ও তেল চালিত গাড়ির ক্ষেত্রে তুলনামূলক আকর্ষণ বিদ্যুৎ চালিত গাড়ির অনুকূলেই যাবে। গাড়ি শিল্পের মুখ থুবড়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে হাজার হাজার শ্রমিকের চাকরি হারানো নিশ্চিত করবে। এর পরও বর্তমানে লাগু থাকা গাড়ির দূষণ সংক্রান্ত স্টেজ চার থেকে স্টেজ ছয়ে উত্তরণ বাধ্যতামূলক করায় বড়ো সমস্যা ডেকে আনবে। এই শর্ত পালন না হলে এপ্রিল ২০২০ থেকে সেই গাড়ির রেজিস্ট্রেশনই হবে না। এই বিষয়টি মাথায় রেখে যেহেতু ৬ মাস পর থেকে স্টেজ ফোর-এর গাড়ি নথিভুক্ত হবে না। সে কারণে ডিলাররা মজুত গাড়ি বেচে দিতে বিশাল ছাড়ের ব্যবস্থা করবে। এমনটা ধরে নিয়ে সম্ভাব্য ভবিষ্যতে স্টেজ ফোর গাড়ির রি-সেল দামই প্রায় থাকবে না। কিন্তু এই স্টেজ সিক্স করতে যে প্রযুক্তি লাগবে তার জন্য গাড়ির দাম আবার বাড়বে ফলে দুষ্টচক্রের মতো চাহিদা বৃদ্ধির আগেই ঘাটতিতে পড়ে যাবে।

বড়ো বড়ো শহরগুলিতে মেট্রো রেলের ব্যাপক প্রসারণ মানুষকে গাড়ি কেনা থেকে নিরস্ত করছে। শুধু তাই নয় যারা কেবল গাড়িতেই সফর করতে চান তাঁরা আজকাল

ওলা উবেরের সাহায্য নিচ্ছেন। নিজের গাড়ি ব্যাপক ভিড়ের মধ্যে দিয়ে টেনশন নিয়ে চালানোর পর পার্কিং করার স্থানাভাব একটা বাড়তি হ্যাপা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একথা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। কাটা ঘায়ে নুনের ছিঁটে দিতে গাড়ির বিমা কোম্পানিগুলি তাদের সালিয়ানা মাশুল বড়ো বৃদ্ধি ঘটিয়েছে যা প্রতি বছরই বেড়ে চলেছে। ব্যাঙ্কের বাইরেও যারা নগদে গাড়ির ঋণ দিত তাদের রাস্তা বন্ধ হওয়ায় গাড়ির চাহিদার টান পড়েছে।

রাজ্যগুলিতে স্বচ্ছতা আনতে অনুৎপাদক সম্পদ চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত নিয়মকানুনের সংস্কার চলায় বাজারে নগদের জোগানে খামতি রয়েছে। কৃষিপণ্যের দামের ওপরও এর প্রভাব পড়েছে। অধিকাংশ প্রধান কৃষিপণ্যের দাম ভয়ংকর ভাবে কমে গেছে। কৃষি অর্থনীতিও কিছুটা মন্দার ধাক্কায় পড়েছে। দু' চাকার গাড়ি, ট্রাক্টর প্রভৃতি বিক্রি কমে যাওয়া এর মূল কারণ। খুব তাড়াতাড়ি এই পরিস্থিতিতে শুধার আনা দরকার।

অর্থমন্ত্রীর কথায় অবশ্যই যুক্তি আছে যে উন্নত প্রযুক্তির চটজলদি প্রয়োগে আজকালকার তরুণ সম্প্রদায় ওলা উবের গাড়ি মিনিটের মধ্যে হাতের কাছে পেয়ে যাচ্ছে। গাড়ির বিক্রি কমার সেটি যে অন্যতম কারণ তা ঠিকই। এর থেকে বেরোবার যে চতুর্মুখী দাওয়াই আছে সরকার তার প্রয়োগে দ্রুত তৎপর হোক। ইস্পাতের দামের ক্ষেত্রে অন্যান্য সুবিধে তুলে নিয়ে দাম কমাক। আইন কানুন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার (নথিবদ্ধকরণ খরচা কমানো পার্কিং-এর জায়গা বাড়ানো) ঠিক করুন। তেলের দামের স্থিতিশীলতা ফেরানো ও অতি উচ্চ জিএসটি ও সেস হারে সংশোধনই গাড়ি শিল্পের হাল ফেরানোর ওষধি। আর এগুলি কেবলমাত্র সরকারই করতে পারে অন্য কেউ নয়।

জিএসটির হারে কিছুটা হ্রাস করার যে দাবি গাড়ি উৎপাদকরা করেছেন তার মধ্যে যে যুক্তি আছে তা আলোচনা হলো। কিন্তু সরকারের মাসিক জিএসটি আদায়ের পরিমাণ যতটা আন্দাজ করা গিয়েছিল তা সব মাসে পরিকল্পিত মাত্রা ছুঁতে না পারায়

গাড়ি শিল্পে জিএসটি-হার ঝপ করে নামিয়ে দিতে সরকার প্রস্তুত নয়। তবুও পুনরাবৃত্তি করছি সরকারের তরফে উল্লেখিত নানাবিধ নিদান বেছে নেওয়ার মধ্যে জিএসটির হার কমানো সর্বাপেক্ষা জরুরি। বাস্তবে কমে যাওয়া জিএসটি হারের ফলে আদায়ের পরিমাণে স্বল্পমেয়াদি ঘাটতি দেখা দিলেও গাড়ি বিক্রির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অচিরেই জিএসটি আদায়ও বেড়ে যাবে।

নগদ সংগ্রহ কম হচ্ছে। সরকার সদ্য কোম্পানি করের হার কমিয়েছে। এর প্রভাব কর আদায়ের মাত্রার ওপর কতটা পড়ে সেটাও আগামীদিনে বোঝা যাবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গাড়ি শিল্পে জিএসটি-হার ঝপ করে নামিয়ে দিতে সরকার প্রস্তুত নয়। তবুও পুনরাবৃত্তি করছি সরকারের তরফে উল্লেখিত নানাবিধ নিদান বেছে নেওয়ার মধ্যে জিএসটির হার কমানো সর্বাপেক্ষা জরুরি। বাস্তবে কমে যাওয়া জিএসটি হারের ফলে আদায়ের পরিমাণে স্বল্পমেয়াদি ঘাটতি দেখা দিলেও গাড়ি বিক্রির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অচিরেই জিএসটি আদায়ও বেড়ে যাবে। ফলে পুষিয়ে যাবে। এই কিছুটা হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতেও এসইউভি গাড়ির যে নতুন মডেল এমজি ও কিয়া মোটরস্ বাজারে এনেছে ক্রেতারা তাতে অত্যন্ত ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। গাড়ি নির্মাতা সংস্থাগুলির মধ্যে কেউ কেউ মন্দের ভালো করছে। রূপালি রেখা দেখাচ্ছে। তারা দামের ক্ষেত্রে অতি সচেতন ক্রেতাদের কথা মাথায় রেখে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিচ্ছে। আধুনিক গাড়ি ক্রেতা সবচেয়ে কমে সবচেয়ে ভালোটা চাইছে। গাড়ি প্রস্তুতকারকদের সর্বাধুনিক ক্রেতাদের চাহিদা মতো তাদের পণ্যেরও বিশ্বমানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মডেলকে পরিমার্জন করতে হবে। গ্রাহক চাহিদার বিশ্লেষণও তাই বিক্রি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকাটা কিন্তু সরকারের আওতাধীন নয়।

(লেখক খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ এবং নিবন্ধ লেখক)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

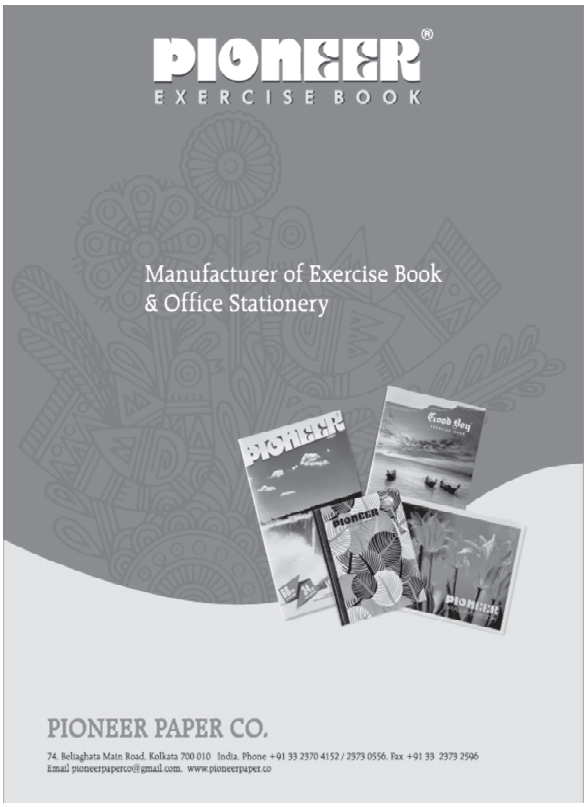

With Best Compliments from :

Sampat Kumar Mandhana

With Best Compliments from :

S. S. GARMENTS

Office & Godown

305, Jessore Road, Kolkata - 700048
Phone : 25226637/1339, M : 9830493575, Fax : (033) 22217899

কাশ্মীর সমস্যা দ্বিপাক্ষিক নয়, ভারতের একান্ত নিজস্ব ও অভ্যন্তরীণ বিষয়

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

সম্প্রতি আমাদের সংবিধান থেকে ৩৭০ ও ৩৫-এ অনুচ্ছেদকে বাদ দেওয়ার ফলে পাকিস্তান ও তার দোসর চীন ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছে। তাদের মতে, এতে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। কাশ্মীরিদের প্রতি ভীষণ অন্যায় করা হয়েছে এবং লঙ্ঘন করা হয়েছে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি। ব্যাপারটাকে তারা টেনে নিয়ে গেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের (ইউ.এন.ও.) দরবারেও।

কিন্তু এক্ষেত্রে দুটো প্রশ্ন ওঠে। প্রথমত, ব্যাপারটা আমাদের সংবিধান সংক্রান্ত। সংবিধানের ৩৬৮ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারটা রয়েছে সংসদ ও রাষ্ট্রপতির হাতে। কিছু নির্দিষ্ট বিষয়কে সংশোধন করতে হলে অবশ্য সংসদের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থনের দরকার হয় এবং কতকগুলোর জন্য রাজ্যগুলোর অন্তত অর্ধেকের সমর্থন লাগে। আর লাগে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর। এক্ষেত্রে বিলটা রাজ্যসভায় ১৩৫/৬১ ও লোকসভায় ৩৫০/৭২ ভোটে গৃহীত হয়েছে। ব্যবধানটা অবশ্যই সুবিশাল। তারপর পেয়েছে রাষ্ট্রপতির সমর্থন।

তাহলে এক্ষেত্রে আপত্তি উঠছে কেন? চীন ও পাকিস্তানের সম্মতি নেওয়া হয়নি বলে? তাহলে কী আমাদের এই দুই দেশের অনুমতি নিতে হবে এই ব্যাপারে?

দ্বিতীয়ত, ৩৭০ নং অনুচ্ছেদটা আছে— আমাদের সংবিধানের একবিংশ অধ্যায়ে যার শিরোনাম 'Temporary, Transitional and special Provisins।' সুতরাং এটা একটা সাময়িক ও অস্থায়ী বিষয়ের প্রতীক। আর তার ৩ নং উপধারায় আছে— রাষ্ট্রপতি তার যে কোনো সংশোধন বা বিলুপ্তি ঘটাতে পারেন। এই কারণে ড. জি. এস. পাণ্ডে মন্তব্য করেছেন,— 'Art. 370 is a temporary provision. It is not intended to be permanent.'— (কনস্টিটিউশানাল ল অব ইন্ডিয়া, পৃ. ৪৩৯)।

কিন্তু পূর্বতন বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের সংকীর্ণ স্বার্থের কারণে এটা স্থায়ী হয়ে উঠেছিল— গত সত্তর বছর ধরে এটা থেকে গিয়েছিল ভোটব্যাঙ্কের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার ফলে। বর্তমানের মোদী সরকার এবার তাই এক সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

পাকিস্তান অবশ্য চীনের সঙ্গে জোট বেঁধে জলঘোলা করার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারস্থ হয়েছিল কয়েকদিনের মধ্যেই। কিন্তু সেখানেও তাদের মুখ পুড়েছে। চীন ছাড়া অন্য চোদ্দোটা সদস্য দেশ এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি, তারা কোনও প্রস্তাবও গ্রহণ করেনি।

এর আগেও পাকিস্তান কাশ্মীর প্রসঙ্গ নিয়ে বহুবার রাষ্ট্রসঙ্ঘে গেছে। তখন এই দেশ ছিল আমেরিকার তাঁবেদার। তাই আমেরিকা ও তার সঙ্গীরা বারবার ব্যাপারটা নিয়ে ভারতকে বিব্রত করতে চেয়েছে, আর রাশিয়া তাতে বাধা দিয়েছে। বর্তমানে আমেরিকা সরে গেছে পাকিস্তানের থেকে বেশ দূরে। তার ফলে চীন ছাড়া তার আর কোনও সঙ্গী জোটেনি।

এইসব দেশের মতে, কাশ্মীর ভারত ও পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক বিষয়, এই কারণেই এটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের আলোচ্য বিষয় হতে পারে না। তাদের এই নির্লিপ্ততা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু যুক্তিটার মধ্যে একটু ফাঁক আছে।

এটা অবশ্যই দ্বিপাক্ষিক বিষয় নয়, এটা ভারতের একান্ত নিজস্ব ও অভ্যন্তরীণ বিষয়। কাশ্মীর নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে একমাত্র ভারতই। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের কোনও ভূমিকাই থাকতে পারে না। এই প্রসঙ্গে ইতিহাসের পৃষ্ঠা একটু উলটানো যাক।

ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শাসন শেষ হওয়ার সময় এই দেশে ছোটো-বড়ো দেশীয় রাজ্য ছিল ৫৬২ টা। তারা ছিল প্রায় স্বাধীন। বাকি দেশটা ছিল ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। তাই দেশের স্বাধীনতার পর দেশীয় রাজ্যগুলোর অবস্থান কী হবে— এই প্রশ্ন উঠলে 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স্ অ্যাক্ট এর সমাধান করেছে। ভারতে বা পাকিস্তানের পক্ষে সেই সব দেশীয় রাজ্যের নবাব বা রাজা 'ইন্সট্রুমেন্ট অব অ্যাকসেশন-এ স্বাক্ষর দিয়ে যোগ দিতে পারবেন, আগের মতো স্বাধীনও থাকতে পারবে। তার ফলে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের রাজা বা নবাব ইচ্ছেমতো ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দিয়েছেন।

কিন্তু কাশ্মীরের রাজা হরি সিংহ স্বাধীন থাকতে চেয়েছিলেন প্রথম থেকেই। তাঁকে ভারতের দিকে আনার জন্য ভারতের বড়লাট কাশ্মীর গেলে তিনি জ্বরের অজুহাতে নির্ধারিত বৈঠকও বাতিল করে দিয়েছেন— সেটা ছিল 'usual illness'. প্রয়োজনে তিনি এটাই করতেন— (লিওনার্ড মস্‌লে— দ্য লাস্ট ডেজ অব দ্য ব্রিটিশ রাজ, পৃ. ২১৩)।

কিন্তু ইতিহাস চলেছে তার নিজের নিয়মে। ১৯৪৭-এর ২২ অক্টোবর প্রায় ২০০০ সৈন্য নিয়ে পাকিস্তান হানা দেয় কাশ্মীরে। তারা দ্রুত গতিতে চলেছিল রাজধানী শ্রীনগরের দিকে। বাধ্য হয়ে রাজা হরি সিংহ তখন ভারতের সাহায্যলাভের আশায় মরিয়া হয়ে প্রধানমন্ত্রী মেহেরচাঁদ মহাজনকে দিল্লি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝেছেন যে, রাজা ইন্সট্রুমেন্টে অব অ্যাকসেশনে স্বাক্ষর না দিলে ভারতের পক্ষে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়। তাই মহাজন তখনই শ্রীনগরে গিয়ে রাজার স্বাক্ষর নিয়ে

ফিরে আসেন। কে বি কেশওয়ানী লিখেছেন, 'Thus the state become an integral part of India'--- (ইন্টার ন্যাশনাল রিলেশান্স, পৃ. ৫৬৬)।

তার ফলে ভারতীয় বাহিনী এক প্রশংসনীয় চেষ্টায় অধিকৃত অঞ্চলের অনেকটাই মুক্ত করেছে। ভি. এন. খান্নার ভাষায়— 'The Indian Army moved rapidly and the invader began to retreat'— ফরেন পলিসি অব ইন্ডিয়া, পৃ. ৬৯)। আর একটু সময় পেলেই বিজয়ী সেনারা কাশ্মীরকে পুরোপুরি মুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু হঠাৎ ভারতের বুদ্ধিহীন প্রধানমন্ত্রী নেহরু যুদ্ধ থামিয়ে বিষয়টাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাঠিয়ে দেন, আর তখন থেকেই পাকিস্তান ও তার মিত্র দেশ এটাকে আন্তর্জাতিক বিষয়ে পরিণত করার চেষ্টা করছে। (আই জে প্যাটেল--- সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পৃ. ১১৮)। আর ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বরে কাশ্মীরের গণপরিষদ কাশ্মীরের ভারতভুক্তি মেনে নিয়েছে— 'confirmed the accession to India'— (অমিত কুমার সেন--- ইন্টারন্যাশনাল রিলেশান্স, পৃ. ৬১৯)। তবে তার একটা অংশ রয়ে গেছে পাকিস্তানের দখলে। সেটা আদৌ আইনগত পদ্ধতিতে নয়— বন্দুকের জোরে এবং নেহরুর নির্বুদ্ধিতার ফলে। কাশ্মীরে পাকিস্তান হানাদার মাত্র তার কোনও নৈতিক বা আইনগত দাবি এক্ষেত্রে খাটে না।

পাকিস্তান সেসময় আইন লঙ্ঘন করেই কাশ্মীরের একটা অংশ দখলে রেখেছে— এটা ড. বিদ্যাধর মহাজনের ভাষায় 'Pak-invasion'— (দ্য কন্‌স্টিটিশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ৩৪৪)। আর সংবিধান বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বসু লিখেছেন, যেসব দেশীয় রাজ্য ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল--- তারা যে পদ্ধতি নিয়েছিল, ঠিক সেই ভাবেই কাশ্মীর ভারতে এসেছে— আইনগত পদ্ধতিটা ছিল একই রকম--- 'in the same form'--- (ইন্ট্রোডাকশান টু দ্য কন্‌স্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২২৮)। সুতরাং কাশ্মীরের ভারতভুক্তি একটা বৈধ, সাংবিধানিক ও ঐতিহাসিক সত্যি। পাকিস্তান এক্ষেত্রে হানাদার--- তার কোনও বৈধ ভূমিকা এক্ষেত্রে নেই। তাই বলা যায় কাশ্মীর ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়।

এটা ঠিক যে, কাশ্মীর একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে--- 'in peculiar circumstancess--- ভারতে যোগ দিয়েছিল— (সহদেব গুপ্ত— দ্য ইন্ডিয়ান কন্‌স্টিটিউশান, পৃ. ২১৬)। কিন্তু তার বৈধতা নিয়ে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। 'ইন্ডিয়ান ইন্ডেপেন্ডেন্স অ্যাক্ট' অনুসারেই সেটা ঘটেছিল আর পরে কাশ্মীরের নির্বাচিত গণপরিষদও সেটা মেনে নিয়েছে। এ.জি. নুরানী লিখেছেন, 'The state of Jammu and Kashmir acceded to the Union of India on October 26, 1947--- (ইন্ডিয়া'জ কন্‌স্টিটিউশান, পৃ. ৫৪৭)।

সুতরাং নিঃসন্দেহে দাবি করা যায় যে, কাশ্মীর একান্তভাবেই ভারতের একটা অঙ্গরাজ্য। সেই কারণেই এক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক কোনও সমস্যা নেই। তার সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারটাও ভারতের নিজস্ব বিষয়— এটা পাক-চীনের মর্জির ওপর আদৌ নির্ভর করে না। বিশেষ করে, ৩৭০ নং অনুচ্ছেদটা সংবিধান অনুসারেই অস্থায়ী ধারা, সেটা পূর্ববর্তী শাসকদের অবিবেচনার ফলেই এতকাল রয়ে গেছিল। ■

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

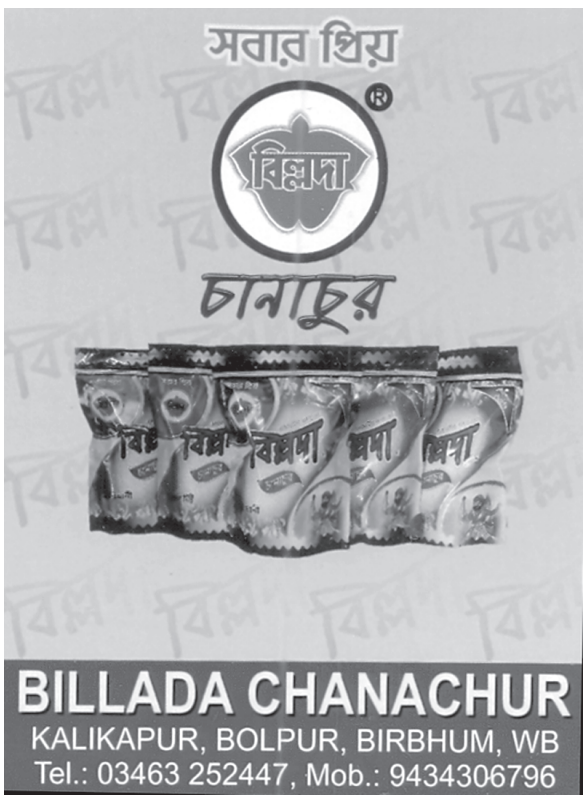

ভারতের জাতীয়তা ও হিন্দুত্ব অভিন্ন

অমিত চক্রবর্তী

রাজনৈতিক স্বার্থে ইসলামের জন্ম হয়েছে। সেজন্য ইসলাম একাধারে জড়বাদী সামরিক মজহব ও রাজনীতি। যারা নির্বিচারে কোরানে আত্মসমর্পণ করে তারাই মুসলমান। পৌত্তলিক, ইহুদি ও খ্রিস্টান বিরোধী কোরানের লক্ষ্য পার্থিব ভোগবিলাস ও ইসলামি সাম্রাজ্যবাদ। অথচ উপনিষদের সারাংশ গীতার লক্ষ্য ভগবৎভক্তি-সহ নিষ্কাম কর্ম। এখানেই ধর্মের অবস্থান। আধ্যাত্মিক স্বার্থেই ভারতীয় ধর্মগুলির সৃষ্টি হয়েছে। কোরান পৃথিবীকে দুটি এলাকায় ভাগ করেছে। দারুল-ইসলাম তথা মুসলমান এলাকা এবং দারুল-হারাব তথা শত্রু এলাকা। উভয় এলাকার মুসলমান আচরণ ভিন্ন প্রকার হয়। কোরানের একেশ্বরবাদ মুসলমানকে সাম্প্রদায়িক করেছে। গণতন্ত্রের বিরোধিতা মুসলমানকে সন্ত্রাসবাদী করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষা মুসলমানকে পরধর্মবিদ্বেষী-জেহাদি করেছে। ইসলামি শাসন হচ্ছে শরিয়তি আইনের শাসন। গণতান্ত্রিক শাসন হচ্ছে অভিন্ন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনের শাসন। গণতন্ত্রে ধর্মীয় আইন নিষিদ্ধ। গণতন্ত্র মানে আপাদমস্তক নির্বাচন নয়। একমাত্র ক্ষমতা লাভের স্থানগুলিতে নির্বাচন থাকে। যেমন— লোকসভা, বিধানসভা, পুরসভা, পঞ্চায়েত ইত্যাদি। অন্যত্র থাকে সর্বদলীয় কমিটি। যেমন—সর্বদলীয় ছাত্র কমিটি, শিক্ষক কমিটি, অভিভাবক কমিটি, শ্রমিক কমিটি, কৃষক কমিটি ইত্যাদি। এছাড়া নির্বাচনে সর্বাধিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে সর্বদলীয় কমিটির নেতৃত্বে সরকার গঠন করা যায়। এক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষ থাকে না।

কোরানের ভিত্তি লজিক বিরোধী বিশ্বাস। এজন্য ইসলামের কোনো সংস্কার করা যায় না। কোরানকে আপ্তবাক্য বলা যায় না। কারণ কোরানে কোনো অতিন্দ্রীয় বিষয় ও আধ্যাত্মিকতা নেই। এছাড়া ইসলামি মজহবের জনক মহম্মদকে সিদ্ধ পুরুষ বলা যায় না। কারণ সিদ্ধ মানবের অন্যতম লক্ষণ 'অখণ্ড জ্ঞান'। ঘোরতর দ্বৈতবাদী সামরিক নেতা মহম্মদ নিজেকে শেষ পয়গম্বর বলে ঘোষণা করেছেন এবং সাম্রাজ্যবাদী হিংসাকে সমর্থন করে বলেছেন যে ইসলামই একমাত্র সত্যধর্ম, অন্যান্য সমস্ত ধর্মই মিথ্যা। অথচ গীতায় অদ্বৈতবাদী অবতার কৃষ্ণ সর্বধর্মসমন্বয় ও যুক্তিসম্মত হিংসাকে সমর্থন করে বলেছেন 'সম্ভবামি যুগে যুগে'। এজন্য পৃথিবীর আদি ধর্ম অপৌরুষেয় সনাতন ধর্ম সংস্কারমূলক ও বিচারমূলক। মাতৃপ্রধান ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারী কখনোই ভোগ্যপণ্য নয়, কিন্তু নারী স্বাধীনতার বিরোধী মধ্যযুগীয় কোরানে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নারীকে ভোগের উপকরণ মাত্র মনে করা হয়। লাভ জেহাদের মাধ্যমে কাফের নারীকে যৌনদাসীতে পরিণত করারও ব্যবস্থা আছে।

কোরানে কয়েকটি বিষয় মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। যেমন— কোরানের কোনো অংশ অমান্য বা সমালোচনা করলে, মহম্মদকে নবি হিসেবে অমান্য বা সমালোচনা করলে, আল্লাহকে অমান্য বা সমালোচনা করলে, কোনো মুসলমান ধর্মান্তরিত হলে, কোনো মুসলমান নারী অমুসলমান পুরুষকে বিবাহ করলে, কোনো মুসলমান নারী অমুসলমান পুরুষের সঙ্গে কথা বললে ও জেহাদের মাধ্যমে ইসলামের বিস্তার না ঘটালে। ইসলামি যুদ্ধ হলো গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে ও মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। জেহাদের মাধ্যমে দখলীকৃত ভূসম্পত্তি হলো 'ওয়াকফ সম্পত্তি'। যদিও ইসলামি দেশে 'ওয়াকফ প্রথা' নিষিদ্ধ। ক্রুশেড-জেহাদের মূলে আছে গড ও আল্লার নামে জমি দখলের লড়াই। মুসলমানরা ইসলাম প্রসারের স্বার্থে অমুসলমানদের কাছে মিথ্যা বলতে পারে ও ছলনার আশ্রয় নিতে পারে। এজন্য ইসলামি ইতিহাস হলো কাফের হত্যার ইতিহাস, বিধর্মীদের ধর্মস্থান ধ্বংসের ইতিহাস ও বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের ইতিহাস।

কোরানের একেশ্বরবাদ অনুসারে মানব চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন আল্লাহ, স্বর্গ, নরক আছে। যেসব মুসলমান জেহাদের মাধ্যমে কাফের বিধর্মীকে মুসলমান করতে পারে, মরণের পরে আকাশস্থিত আল্লাহ তাদের ইন্দ্রিয়সুখে পূর্ণ স্বর্গে প্রেরণ করে ও অবশিষ্টদের নরকে নিক্ষেপ করে। একই কথা খ্রিস্টানদের গডের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে আকাশে কোনো সাম্প্রদায়িক সত্তা নেই। আল্লাহ ও গড কল্পনামাত্র। এজন্য পৃথিবীর কোনো মুসলমান ও খ্রিস্টান আল্লাহ ও গডের পরিচয় জানে না। ইদানীং শিক্ষিত মুসলমান ও খ্রিস্টানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বা নাস্তিকতার প্রাবল্য দেখা যাচ্ছে। পক্ষান্তরে অদ্বৈতবেদান্ত অনুসারে মানবচেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ভগবান, স্বর্গ, নরক নেই। মানবমনের উচ্চস্তর স্বর্গ, নিম্নস্তর নরক। মানুষ তথা শক্তির স্বরূপই হলো প্রেমময়। সর্বময় ভগবান, ভগবানকে

ভালোবাসলেই বিশ্বপ্রেম হয়ে যায়। বিশ্বপ্রেমের প্রতীক অর্ধনারীশ্বর রাধাকৃষ্ণ। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নিয়ে মনুষ্য জীবন ভগবানের ইচ্ছাযোগে কালযুক্ত ভাগ্য ও অবিদ্যা মায়া নিয়ন্ত্রিত। এজন্য মানুষের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ। ভগবানই একমাত্র হেতুকর্তা, মানুষ প্রযোজ্যকর্তা মাত্র। মানুষের কর্ম সকাম কিন্তু ভগবানের কর্ম নিষ্কাম। অবিদ্যা মায়ার অধীনেই মানুষ পাপকর্ম করে। ভাগ্য ও কর্ম পরস্পরের পরিপূরক। মানুষ ভাগ্য নিয়ে ইহলোকে আসে ও কর্মসংস্কার নিয়ে পরলোকে চলে যায়। ভগবান ভাগ্যানুসারে মানুষকে ভক্তি, শক্তি, মুক্তি ইত্যাদি দান করেন। যৌন পবিত্রতা ও আর্থিক পবিত্রতাই হলো শ্রেষ্ঠ পবিত্রতা। পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার সমন্বয়ে শিক্ষার সম্পূর্ণতা। কৃষি ও শিল্প পরস্পরের পরিপূরক। কৃষি থেকে শিল্প, গ্রাম থেকে নগর, রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র— মানবসভ্যতার বিবর্তনমাত্র।

আধুনিক বিজ্ঞান অদ্বৈতবাদী দর্শনের সমর্থক কিন্তু দ্বৈতবাদী দর্শন তথা একেশ্বরবাদের বিরোধী। বিবেকানন্দের মতে দ্বৈতবাদ ও জড়বাদ অভিন্ন। অদ্বৈতবেদান্ত দর্শন ও আধুনিক বিজ্ঞান পরস্পর পরিপূরক। অদ্বৈতবেদান্তের জ্ঞানবাদী ভাষ্য অনুসারে ভগবান তিনকালেই অখণ্ড আছেন। নির্বিকল্প সমাধিতে সেটি বোঝা যায়। এটিই মানুষের স্বরূপ। কিন্তু অবিদ্যা মায়ার জন্য অখণ্ডে দ্বৈতভ্রান্তি হয়, চৈতন্যে জড়ভ্রান্তি হয়, ক্ষুদ্র আমি-আমার ভ্রান্তি হয়, নাস্তিকতা আসে। অনির্বচনীয় অবিদ্যা মায়া হলো ভ্রম উৎপাদনকারী অজ্ঞানতা। এর সাহায্যে ভগবান সমগ্র জগৎকে সম্মোহিত করে রাখেন। অবিদ্যা মায়ার জন্য তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবকে মেলানো কঠিন হয়ে যায়। এজন্য নিত্য ব্রহ্ম চরম সত্য কিন্তু লীলা স্বালম্বন ভ্রান্তি মাত্র। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি, শুক্তিতে রজতভ্রান্তি তেমন ব্রহ্মে জগৎভ্রান্তি। পক্ষান্তরে অদ্বৈতবেদান্তের ভক্তিবাদী ভাষ্য অনুসারে ভগবান আপন স্বরূপে অখণ্ড হলেও লীলার জন্য বহুশক্তিরূপে নিজেকে বিভক্ত করেন। কারণ তিনি রসময়, আনন্দময়। জলের মধ্য থেকে তরঙ্গ উঠে যেমন জলেই বিলীন হয়, নিরাকার জল থেকে যেমন সাকার বরফ তৈরি হয় তেমন জড়, জীব, উদ্ভিদ, মানুষ, প্রতিমা, দেবতা, অন্ন ইত্যাদি সমস্তই নিরাকার সচ্চিদানন্দ সমুদ্রের নাম-রূপের তরঙ্গবিকার মাত্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সারাংশই হলো নিরাকার অর্ধনারীশ্বর সচ্চিদানন্দ (একাধারে কালের বাইরে নিষ্ক্রিয় সৎ স্বরূপ পুরুষ ও কালের ভিতরে সক্রিয় চিদানন্দ স্বরূপ প্রকৃতি)। জন্ম-মৃত্যু হলো ঘর বদলের খেলা। শক্তিমান ও শক্তি পরস্পর পরিপূরক। এজন্য নিত্য ব্রহ্ম চরম সত্য কিন্তু লীলা তথা জগৎ ব্যবহারিক সত্য। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পর পরিপূরক। জ্ঞানে জানা যায় কিন্তু ভক্তিতে পাওয়া যায়। সেজন্য ভক্তির মধ্য দিয়ে জ্ঞানের দিকে চলা, সীমার মধ্য দিয়ে অসীমের দিকে চলাই জীবনের ধর্ম। সচ্চিদানন্দ যুক্ত মানবতাই একমাত্র মনুষ্যধর্ম। জীবনের প্রাথমিক লক্ষ্য ভগবৎভক্তি, অর্থোপার্জন ও বিষয়ভোগ। কিন্তু চরম লক্ষ্য অখণ্ডজ্ঞান তথা আত্মজ্ঞান তথা মুক্তি। 'সোঽহং' বা 'তত্ত্বমসি' বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'— জীবনের শেষ কথা। ভগবৎভক্তি ছাড়া সংসার থাকে না, রিপু সংযত হয় না, মনে অবসাদ আসে। ধর্মানুশীলন, যোগানুশীলনের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি হলেই ভগবৎভক্তি অর্জিত হয়। পরস্পরের পরিপূরক নারী-পুরুষের মধ্যে প্রাকৃতিক বৈষম্য থাকলেও জন্মগত ত্রিবিধ মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ সমান। ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য মানুষকে ত্রিবিধ সংগ্রাম করতে হয়। ত্রিবিধ মৌলিক অধিকার— (১) আর্থিক কর্ম ও আর্থিক নিরাপত্তার অধিকার, (২) মাতৃভাষা ও শিক্ষা-স্বাস্থ্যের অধিকার, (৩) আধ্যাত্মিক কর্ম ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার। ত্রিবিধ সংগ্রাম— (১) সামাজিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, (২) প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, (৩) ষড় রিপুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

অদ্বৈতবাদ অনুসারে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাত্র চার আনা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অবশিষ্ট বারো আনাই অতিন্দ্রিয়। কোয়ান্টাম স্তরে যেমন অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটে তেমন স্থূল জগতেও ঘটে। নিরাকার ঈশ্বর থেকে সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয় আবার প্রলয়কালে সমস্ত কিছু নিরাকার ঈশ্বরে বিলীন হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লবের ফলে একেশ্বরবাদী সাম্প্রদায়িক ইসলাম ক্ষয়িষ্ণু হয়ে গেছে কিন্তু খ্রিস্টান সভ্যতা আধুনিক হয়েছে। শিল্প বিপ্লবের পরিণাম হলো বিজ্ঞানের উন্নতি, ব্যবহারিক জীবনে যুক্তিবাদ, ফরাসি বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা, ইতালির ঐক্য আন্দোলন, নভেম্বর বিপ্লব, বঙ্গপ্রদেশ তথা ভারতের সাংস্কৃতিক নবজাগরণ। জাতীয়তা মানে জাতি বৈরিতা নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের সংগ্রাম। জাতীয়তাবোধ ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনা অসম্ভব। জাতি ও নাগরিকত্ব আলাদা। বহির্ভারতে প্রধানত তিন প্রকার দেশ দেখা যায়। (১) সেকুলার গণতান্ত্রিক জাতি দেশ (রাষ্ট্রধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি বাইবেল, রাষ্ট্রশক্তির উৎস শিক্ষিত জনতা)। (২) থিয়োক্র্যাটিক মুসলমান দেশ (দেশধর্ম ও দেশনীতি কোরান, শক্তির উৎস সেনাবাহিনী)। (৩) একদলীয় কমিউনিস্ট দেশ (দেশনীতি কমিউনিজম, শক্তির উৎস সেনাবাহিনী)।

ভারতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ক্ষেত্র হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা- সাহিত্য ও অদ্বৈতবেদান্ত দর্শন। ৫১টি সতীশক্তিপীঠ প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক পরিচয় বহন করছে। ভারতের জাতীয়ত্ব ও হিন্দুত্ব অভিন্ন। ভারতীয় জাতীয়তা বৈদান্তিক জাতীয়তা। বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার প্রতিক্রিয়ায় সৈয়দ আহমেদ ভারতে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রচার করেছিলেন। বিবেকানন্দের মত অনুসারে ভারত হবে 'বৈদান্তিক গণসমাজতান্ত্রিক সার্বভৌম ভারতীয় গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র (রাষ্ট্রদর্শন অদ্বৈতবেদান্ত, রাষ্ট্রনীতি গীতা (জাতীয় গ্রন্থ), রাষ্ট্রশক্তির উৎস শিক্ষিত জনতা)।

রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ ও চিরস্থায়ী সাফল্য অর্জনের জন্য সমস্ত দেশবাসীকে সচেতন হতে হবে : মোহনরাও ভাগবত

এই বিজয়াদশমীর আগে গত প্রায় এক বছর সময় গুরুনানক দেবের আবির্ভাবের ৫৫০তম বর্ষ এবং স্বর্গীয় গান্ধীজীর জন্মের সার্ধশত বর্ষের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই উপলক্ষ্যে পালনীয় কার্যক্রম আরও কিছুদিন চলবে। কিন্তু গত বছরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বছরটিকে আমাদের জন্য আরও স্মরণীয় করে দিয়েছে।

গত মে মাসে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বেরিয়েছে। এই নির্বাচন সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ভারতবর্ষের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশাল দেশে নির্বাচন কীভাবে সঠিক সময়ে এবং ব্যবস্থিত ভাবে সম্পন্ন হয়, তা দেখা বিশ্ববাসীর আকর্ষণের প্রথম কারণ ছিল। সেরকমই ২০১৪-তে আসা পরিবর্তন শুধু ২০১৪-র আগেকার সরকারের প্রতি মোহভঙ্গ থেকে উৎপন্ন কোনও নেতিবাচক রাজনৈতিক জোয়ারের পরিণাম নয়, বরং বিশেষ দিশায় যাওয়ার জন্য জনগণ মনঃস্থির করেছে, ২০১৯-এর নির্বাচনে তাও দেখার ছিল। বিশ্বের দৃষ্টি ছিল সেদিকেও। জনগণ তাদের দৃঢ় রায় ব্যক্ত করেছে। ভারতের গণতন্ত্র যে বিদেশ থেকে আমদানি করা নয়, বরং জনমানসে শত শত বছর ধরে চলে আসা পরম্পরা ও স্বাধীনোত্তর কালে অর্জিত উপলব্ধি এবং তার পরিণাম স্বরূপ গণতন্ত্র বজায় রাখা এবং তাকে সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করার বিষয়ে জনগণ যে মানসিক ভাবে তৈরি, তা সকলেই বুঝতে পেরেছেন। নতুন সরকারকে আরও বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা-সহ পুনরায় নির্বাচিত করে জনগণ তার বিগত কার্যকলাপের প্রতি সম্মতি এবং আগামীদিনের জন্য আরও অনেক প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে।

জন ভাবনাকে সম্মান করে, সেই প্রত্যাশাকে বাস্তবায়িত করে, তাদের ইচ্ছা

পূরণ করার সাহস যে এই দ্বিতীয় বার নির্বাচিত সরকারের আছে, তা আরও একবার সরকারের ৩৭০ ধারা বাতিলের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের মজ্জায় এই ধরনের কাজ করার ভাবনা আগে থেকেই রয়েছে। কিন্তু এরা সুকৌশলে সংসদের উভয় কক্ষে ভিন্ন মতাবলম্বী কয়েকটি দলের সমর্থন নিয়ে জনসাধারণের ভাবনার অনুরূপ এবং দৃঢ় যুক্তির সঙ্গে এই যে কাজ হয়েছে, তার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমেত শাসকদল ও এই জন ভাবনাকে সমর্থনকারী অন্য দলগুলিও অভিনন্দনের যোগ্য।

এই উদ্যোগ তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন ৩৭০ ধারার প্রভাবে করতে না পারা উচিত কাজগুলো সম্পন্ন হবে। সেটির প্রভাবে চলে আসা অন্যায়ের সমাপ্তি ঘটবে। দেশভক্ত ও হিন্দু হিসেবে থাকার সাপেক্ষে সেখান থেকে অন্যায় ভাবে বিতাড়িত কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পুনর্বাসন বাস্তবায়িত হবে। কাশ্মীরের অধিবাসীরা অনেক অধিকার, যা থেকে তারা এখনো বঞ্চিত, তা পাবে এবং উপত্যকার বন্ধুদের মনে যে ভুল আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে যে ৩৭০ ধারা বাতিলের ফলে তাদের জমি, চাকরি ইত্যাদির উপর সংকট দেখা দেবে, তা দূর হবে এবং তারা আত্মীয় ভাব নিয়ে অবশিষ্ট ভারতের জনগণের সঙ্গে দেশের উন্নতিতে নিজেদের দায়িত্ব সমান ভাবে পালন করবে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে নিজেদের প্রতিভা দিয়ে বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাদের প্রশংসা ও সহানুভূতি লাভ করে আমাদের বিজ্ঞানীরা চাঁদের অদেখা দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান 'বিক্রম'কে পাঠিয়েছে। যদিও প্রত্যাশামতো সাফল্য আসেনি, কিন্তু প্রথম প্রচেষ্টাতেই এতটা করা কিছু কম নয়। আমাদের বিজ্ঞানীদের এই অভিযানের ফলে আমাদের দেশের বৌদ্ধিক প্রতিভা ও বিজ্ঞান চেতনা এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে সংকল্প পূর্ণ করার প্রতি সারা বিশ্ব সম্মান দেখিয়েছে। জনগণের পরিপক্ক বুদ্ধি ও কাজ, দেশে স্বাভিমানের জাগরণ, সরকারের দৃঢ় সংকল্প এবং তার সঙ্গেই আমাদের বিজ্ঞানীদের সামর্থ্যের ধারণা— এই সব সুখানুভবের জন্য বিগত বছরটি আমাদের কাছে চিরকাল স্মরণীয় থাকবে।

কিন্তু এই সুখের পরিবেশে অলস হয়ে নিজেদের সচেতনতা ও উৎসাহ ভুলে, সবকিছু সরকারের উপর ছেড়ে দিয়ে, নিষ্ক্রিয় হয়ে বিলাসিতা ও স্বার্থে মগ্ন হলে চলবে না। যে দিশাতে আমরা চলা শুরু করেছি, সেই অন্তিম লক্ষ্য 'পরম বৈভবশালী ভারত' এখনো দূরে রয়েছে। পথের কাঠিন্য, বাধা এবং আমাদের প্রতিহত করার ইচ্ছা পোষণকারী শক্তির কার্যকলাপ এখনো শেষ

হয়নি। আমাদের সামনে কিছু সংকট আছে যা থেকে পরিত্রাণের উপায় বের করতে হবে। কিছু প্রশ্ন আছে যার উত্তর আমাদের দিতে হবে এবং কিছু সমস্যা আছে যার সমাধান করতে হবে।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের সুরক্ষার স্থিতি, সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি, আমাদের সরকারের সুরক্ষা নীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কুশলী অবস্থান থেকে প্রমাণিত যে এ বিষয়ে আমরা সজাগ ও আশ্বস্ত। আমাদের স্থল ও জল সীমান্তে সতর্কতা আগে থেকেই আছে। শুধু স্থল সীমান্তরক্ষী ও সীমা চৌকির সংখ্যা এবং জল সীমান্তে বিশেষভাবে দ্বীপগুলির উপর সতর্কতা আরও বাড়াতে হবে। দেশের ভিতর সন্ত্রাসবাদী হিংসা কম হয়েছে। সন্ত্রাসবাদীদের আত্মসমর্পণের সংখ্যাও বেড়েছে।

ব্যক্তি জীবনে বা বিশ্বে সংকটের পরিস্থিতি সবসময়ই থাকে। কিছু সংকট সামনে দেখা যায়। কিছু সংকট পরবর্তী সময়ে সামনে আসে। নিজের শরীর মন বুদ্ধি যত সজাগ, সুস্থ ও প্রতিকারক্ষম থাকবে ততই সংকট থেকে বাঁচার সম্ভাবনা বাড়ে। কিন্তু মানুষের মনে সংকটের ভয় থেকেই যায়। অনেক ধরনের সংকটের উপাদান আমাদের শরীরের মধ্যেই বাস করে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম হলেই সেগুলি মাথাচাড়া দেয়, না হলে কোনো উৎপাত হয় না।

আমরা জানি যে, বিগত কিছু বছরে ভারতের চিন্তাধারার দিশায় এক পরিবর্তন এসেছে। সেটি পছন্দ না করার মতো ব্যক্তি বিশ্বেও আছে, আর ভারতেও আছে। ভারতের অগ্রগতি যাদের স্বার্থের পক্ষে হানিকর সেই সব শক্তি ভারতকে দৃঢ় ও শক্তিশালী হতে দিতে চায় না। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের সমাজের একাত্মতা, সততা ও সমরসতার স্থিতি যেরকম হওয়া উচিত বর্তমানে সেইরকম নয়। এর লাভ উঠিয়ে সেসব শক্তি যে অপকর্ম চালায় তা আমরা দেখছি। জাতপাত, মত-পথ, ভাষা, প্রান্ত ইত্যাদির ভিত্তিতে পরস্পরকে পৃথক করা; পারস্পরিক মতভেদকে উস্কে দিয়ে আগে থেকেই চলে আসা বিভেদের ফাটল আরও বাড়িয়ে তোলা, মনগড়া কৃত্রিম পরিচয়ের ভিত্তিতে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে এই দেশের অভিন্ন সামাজিক ধারায় ভিন্ন ভিন্ন পরস্পর-বিরোধী প্রবাহ উৎপন্ন করার চেষ্টা চলছে। সজাগ থেকে এসব কুচক্রকে শনাক্ত করে বৌদ্ধিক ও সামাজিক স্তরে তার প্রতিকার করতে হবে। সরকার ও প্রশাসনে কার্যরত ব্যক্তিদের দ্বারা সৎ উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত নীতি, প্রচারিত বক্তব্য এবং গৃহীত সিদ্ধান্তকে বিকৃত করে বা ভুল মানে করে প্রচার করে নিজেদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য এসব শক্তি উপদ্রব করে। তার জন্য সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। এরকম সমস্ত গতিবিধির মাধ্যমে কোথাও না কোথাও দেশের আইন, নাগরিক অনুশাসন ইত্যাদির প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপন্ন করার গোপন অথবা প্রকাশ্য প্রয়াস চলতে থাকে। সব স্তরে এর ভালোমতো প্রতিকার হওয়া উচিত।

আজকাল সংবাদপত্রে এরকম খবর প্রায়ই আসে যে আমাদের এই সমাজের একটি গোষ্ঠী অন্য এক গোষ্ঠীর লোককে আক্রমণ করে তাকে গণহিংসার বলি করেছে। এরকম ঘটনা শুধু এক পক্ষের নয়। উভয় পক্ষের কাছ থেকেই এই রকম ঘটনা শোনা যায় অর্থাৎ অভিযোগ পালটা-অভিযোগ চলতেই থাকে। কিছু ঘটনা যে জেনে বুঝে সংঘঠিত ও কিছু ঘটনা যে অসংলগ্ন ভাবে প্রকাশিত, এ ব্যাপারটাও সামনে এসেছে। কিন্তু কোথাও না কোথাও আইনি ব্যবস্থার সীমা লঙ্ঘন করে হিংসক প্রবৃত্তি যে সমাজে পারস্পরিক সম্বন্ধ নষ্ট করে নিজেদের দাপট দেখাচ্ছে এটা মানতেই হবে। এই প্রকৃতি আমাদের দেশের পরম্পরা নয় এবং আমাদের সংবিধান সম্মতও নয়। যতই মতভেদ হোক, যতই উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটুক, আইন ও সংবিধানের মধ্যে থেকে, পুলিশি ব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে ও বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা রেখে আমাদের চলতে হবে। স্বাধীন দেশের নাগরিকের এটাই কর্তব্য। এরকম ঘটনায় লিপ্ত লোকেদের সঙ্ঘ কখনোই সমর্থন করেনি এবং সঙ্ঘ এরকম ঘটনার ঘোর বিরোধী। এরকম ঘটনা যাতে না ঘটে তা জন্য স্বয়ংসেবকেরা সচেষ্ট থাকে। কিন্তু এরকম ঘটনা যা আমাদের পরম্পরা নয়, 'লিঞ্চিং' নাম দিয়ে তাকে পরম্পরা রূপে দেখিয়ে সম্পূর্ণ দেশ ও হিন্দু সমাজকে সর্বত্র বদনাম করার চেষ্টা, তথাকথিত সংখ্যালঘুদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার চেষ্টার যে ষড়যন্ত্র চলছে এটা আমাদের বুঝতে হবে। উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ভাষা ও কাজ সকলকেই এড়িয়ে চলতে হবে। বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থের জন্য ওকালতির আড়ালে পরস্পরকে লড়িয়ে দিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধিতে উদ্যোগী তথাকথিত নেতাদের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। এরকম ঘটনায় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার মতো আইনি ব্যবস্থা এই দেশে রয়েছে। সততা ও দৃঢ়তার সঙ্গে তার সদ্ব্যবহার করতে হবে।

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব, বিনিময় ও সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। সমাজের সব শ্রেণীর মধ্যে সদ্ভাব, সমরসতা ও সহযোগিতা এবং আইন ও সংবিধানের মধ্যে থেকে নিজেদের মতের বহিঃপ্রকাশ ও স্বার্থ রক্ষার জন্য সচেষ্ট হওয়ার অনুশাসন পালন আজকের পরিস্থিতিতে একান্তই প্রয়োজন। এই ধরনের মত বিনিময়, সহযোগিতা বাড়ানোর প্রয়াস সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা করে চলেছে। তার পরেও কিছু নির্ণয় ন্যায়ালয়ের মাধ্যমেই হয়। নির্ণয় যাই হোক, দায়িত্বশীল নাগরিকদের ভাষা ও কাজ এমনই হবে যাতে কোনোভাবেই পারস্পরিক সদ্ভাব ক্ষুণ্ণ না হয়। এই কাজ কোনো এক বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়, এটা সকলের দায়িত্ব। সকলের তা পালন করা উচিত এবং নিজেকে দিয়েই শুরু করতে হবে।

বিশ্বের আর্থিক মন্দার ক্ষতিকর প্রভাব সর্বত্র কিছু পড়ে। আমেরিকা ও চীনের মধ্যেকার আর্থিক রেষারেষির পরিণাম ভারত সমেত অন্য দেশগুলোকেও ভুগতে হয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের কিছু উপায় সরকার গত দেড়মাসে অবলম্বন করেছে। জনগণের মঙ্গলের প্রতি সরকারের সংবেদনা ও তার সক্রিয়তার পরিচয় এর থেকে অবশ্যই পওয়া যায়। এই তথাকথিত মন্দাবস্থা থেকে আমরা অবশ্যই বেরিয়ে আসব, আমাদের আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্বদের অবশ্যই সেই সামর্থ্য আছে। আর্থিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য সরকার প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি দিতে ও শিল্প বাণিজ্যের বেসরকারিকরণে বাধ্য হচ্ছে। তবে সরকারের কিছু লোককল্যাণকর নীতি ও কার্যক্রম নীচের স্তরে লাগু করার ক্ষেত্রে

অধিক তৎপরতা, ক্ষমতা অর্থাৎ অনাবশ্যক কঠোরতা লাঘব করলে অনেক কিছু ঠিক হতে পারে।

পরিস্থিতির চাপের কারণে ব্যবস্থা গ্রহণের সময় স্বদেশি ভাবনা বিস্মৃত হলেও ক্ষতি হতে পারে। দৈনন্দিন জীবনে দেশভক্তির অভিব্যক্তিকেই স্বর্গীয় দত্তোপন্ত ঠেংড়িজী 'স্বদেশি' মনে করতেন। স্বর্গীয় বিনোবা ভাবেজী এর অর্থ 'স্বাবলম্বন ও অহিংসা' করেছেন। সমস্ত ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা ও সকলের উপার্জনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম শক্তিই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে, বাড়াতে পারে এবং স্বয়ং সুরক্ষিত থেকে বিশ্বমানবতাকেও এক সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ দিতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতি অনুসারে যদি কোনো ঘোরালো দূরের পথও বাছতে হয় তবুও লক্ষ্য তো স্বসামর্থ্য তৈরি করে বাধ্যবাধকতা থেকে চিরকালের জন্য বেরিয়ে আসাই হওয়া উচিত।

কিন্তু সাময়িক সংকট অর্থাৎ বিশ্বজোড়া আর্থিক উত্থান-পতনের পরিমাণ আমাদের অর্থ ব্যবস্থার উপর যতটা সম্ভব কম হওয়ার জন্য আমাদের একেবারে গোড়ায় গিয়ে ভাবতে হবে। আমাদের নিজস্ব দৃষ্টি নিয়ে, আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে তার কথা মনে রেখে আমাদের জনগণের স্বরূপ ও পরিবেশ মনে রেখে, আমাদের নিজস্ব সম্পদ ও জনগণের কথা চিন্তা করে, আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে সফল করতে সক্ষম আর্থিক দৃষ্টিকে সামনে রেখে নীতি প্রণয়ন করতে হবে। বিশ্বে প্রচলিত আর্থিক মতবাদ অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। সেগুলো অনেক দিক থেকে অসম্পূর্ণ একথা বহু অর্থনীতিবিদ বলছেন। এরকম অবস্থায় যতটা সম্ভব কম শক্তি ব্যবহার করে যতটা সম্ভব বেশি উপার্জন দিতে সক্ষম পরিবেশের পক্ষে উপকারী, আমাদেরকে সব বিষয়ে স্বনির্ভর করতে সক্ষম এবং নিজের ক্ষমতা বলে সারা বিশ্বের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থে বাণিজ্য সম্পর্ক বাড়াতে পারে এরকম সামর্থ্য আমাদের মধ্যে জাগাতে পারে— এরকম আর্থিক দৃষ্টি, নীতি ও ব্যবস্থা নির্মাণ করার দিশায় আমাদের এগোতেই হবে।

স্বাধীনতার এত বছর পরেও এই 'স্ব'-এর চিন্তা করার জন্য আমরা কম পড়ে যাচ্ছি। এর মূলে, পরাধীনতার সময় যোজনাবদ্ধ ভাবে আমাদের দাস তৈরি করার জন্য যে শিক্ষার প্রচলন করা হয়েছিল তা স্বাধীনতার পরেও আমরা বলবৎ রেখেছি। আমাদের নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থার গঠনও ভারতীয় দৃষ্টিতে করতে হবে। বিশ্বে শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পর্যালোচনা করলে 'স্ব'-ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাই যে সেই সব দেশের শিক্ষায় উন্নতির কারণ, তা স্পষ্ট হয়। স্বভাষা, স্বভূষা, স্বসংস্কৃতির সম্যক পরিচয় অর্থাৎ সেই বিষয়ে গৌরব প্রদানকারী কালোপযোগী, তর্কশুদ্ধ, সত্যনিষ্ঠ, কর্তব্যবোধ এবং বিশ্বের প্রতি আত্মীয়তার দৃষ্টিকোণ ও জীবের প্রতি করুণা ভাব প্রদানকারী শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের চাই। পাঠ্যক্রম থেকে শুরু করে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সব কিছুরই আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। শুধু কাঠামোগত পরিবর্তনে কাজ হবে না।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই সব বিষয়ের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে চলে আসা পারিবারিক সংস্কারের স্খলন এবং সামাজিক জীবনে মূল্যবোধ বর্জিত আচরণ— খুব বড় সমস্যা সৃষ্টির কারণ। যে দেশে 'মাতৃবৎ পরদারেষু'র ভাবনা ছিল, মহিলাদের সম্মান রক্ষার জন্য রামায়ণ, মহাভারতের মতো মহাকাব্যিক সংগ্রাম হয়েছিল, আত্মসম্মান রক্ষার জন্য জহরব্রতের মতো বলিদান হয়েছিল, সেই দেশে আজ মহিলারা না সমাজে, না পরিবারে কোথাও সুরক্ষিত নয়। সেখানে নানা ধরনের ইঙ্গিতবাহী ঘটনা ঘটেছে যা আমাদের পক্ষে লজ্জাকর। আমাদের মাতৃশক্তিকে প্রবুদ্ধ, স্বাবলম্বী ও আত্মরক্ষায় সক্ষম করে তুলতে হবেই। মহিলাদের প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের সংস্কৃতির পবিত্রতা ও শালীনতার সংস্কার অবশ্যই যুক্ত করতে হবে।

আমরা সবাই জানি যে, বাল্য বয়স থেকেই বাড়ির পরিবেশে এই শিক্ষা শুরু হয়। কিন্তু আজকের 'অতি ছোটো' পরিবারে তার একান্তই অভাব। এর আরও এক ভয়ংকর লক্ষণ হলো নবীন প্রজন্মে মধ্যে ক্রমবর্ধমান মাদকাসক্তি। এক সময় চীনের মতো সাংস্কৃতিক ভাবে সমৃদ্ধ দেশের তরুণদের নেশাগ্রস্ত করে বিদেশি শক্তি তাদের নিঃস্ব করে দিয়েছিল। এই ধরনের নেশায় আসক্ত না হওয়ার, সচ্চরিত্রের প্রতি আগ্রহ ও মোহগ্রস্ত না হয়ে, এর বিপদ থেকে দূরে থাকার দৃঢ় মানসিকতা যদি পরিবারে তৈরি না হয়, তবে নেশার প্রকোপ ঠেকানো খুবই কঠিন হবে। এই দৃষ্টিতে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে সকল অভিভাবকের সজাগ ও সক্রিয় হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

সমাজে সর্বত্র অনুভূত আর্থিক ভ্রষ্টাচার ও চরিত্রভ্রষ্ট আচরণ মূলত এই সংস্কারহীনতার কারণেই উৎপন্ন হয়। মাঝে মধ্যে একে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন তৈরি হয়, কতিপয় ভ্রষ্টাচারীকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার দৃষ্টান্তও স্থাপিত হয়। কিন্তু উপরের এই স্বচ্ছ ও পরিষ্কার স্তরের নীচে সাধারণ স্তরে দুর্নীতি চলতেই থাকে। আর কোথাও কোথাও তারা এই সব উপায়কেই আশ্রয় করে রসেবশেই আছে, এরকম দেখা যায়। সৎ ব্যক্তি এসব কড়া আইন পালনের জাঁতাকলে পড়ে ছটপট করে, আর যাদের আইন ও লাজ-লজ্জার কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই, এরকম নির্লজ্জ ও উদ্ধত লোকেরা এই ব্যবস্থাকে ধোঁকা দিয়ে ফুলেফেঁপে ওঠে। এটা শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়। বিনা শ্রমে বা কম শ্রমে ও বিনা যোগ্যতায় অধিক পাওয়ার লালসা আমাদের মনে বসে গিয়েছে। এটি এরকম ভ্রষ্ট আচরণের মূল কারণ। সামাজিক পরিবেশে, পরিবারে সব ধরনের প্রবচন ও নিজের আচরণের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এই পরিস্থিতিকে পাল্টানো, এই দেশের স্বাস্থ্য ও সুব্যবস্থার জন্য অনিবার্য কর্তব্য।

সমাজে প্রবচন বা সমাজে পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্যিক লক্ষ্য নিয়ে শুধু মুখরোচক ও শিহরণ জাগানো বিষয় উপস্থাপনের মোহ থেকে বেরিয়ে, যদি মাধ্যমগুলিও এই পরিবেশ সৃষ্টির কাজে যুক্ত হয়, তবে এই কাজ আরও গতি পেতে পারে।

আমাদের সমাজের ভিতরকার পরিবেশ, যেরকম আমরা সবাই সজাগ হয়ে সেই পরিবেশ সুস্থ রাখার চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পৃথকভাবে চিহ্নিত করি, সেরকমই সম্পূর্ণ বিশ্বের বাহ্যিক পরিবেশের সমস্যা মানব সমাজের ব্যাপক মনোযোগের

দাবি করছে। পরিবেশকে সুস্থ রাখার জন্য বড়ো নীতিগত উপায়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি তো সব দেশেরই পরিবেশ নীতিতে গুরুত্বও এই দিশাতে পরিণামদায়ক হতে পারে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা এই ক্ষেত্রে এরকম অনেক কাজ আগে থেকেই করছে। তাদের এই সমস্ত প্রচেষ্টাকে সুব্যবস্থিত রূপ দিয়ে, সামাজিক গতিবিধি হিসাবে আরও এগিয়ে যাওয়ার কাজও 'পরিবেশ গতিবিধি' নামে শুরু হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ গত ৯ দশক ধরে সমাজে একাত্মতা, সদ্‌ভাবনা, সদাচরণ ও সদ্‌ব্যবহার এবং এই ভাবনা নিয়ে রাষ্ট্রের প্রতি স্পষ্ট দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা উৎপন্নের কাজ করে আসছে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সেবা ভাবনা ও সমর্পণের বিষয়ে দেশে সর্বত্র বিশ্বাস জেগেছে, এরকম মনে হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সঙ্ঘের সংস্পর্শে যাঁরা আসেননি তাঁদের মধ্যে সঙ্ঘের প্রতি অবিশ্বাস, ভয় ও শত্রুতা তৈরির চেষ্টা করা হয়। সঙ্ঘ হিন্দু সমাজের সংগঠন করে এর অর্থ যে নিজেকে হিন্দু বলে না এমন শ্রেণী, বিশেষভাবে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন— এরকম নিতান্তই অসত্য ও অবান্তর প্রচার চালানো হয়। হিন্দু সমাজ, হিন্দুত্বের সম্বন্ধে অনেক প্রমাণহীন, বিকৃত অভিযোগ এনে তাদেরকেও বদনাম করার চেষ্টা করা হয়। এসব কুচক্রের পিছনে আমাদের সমাজে নিরন্তর বিভাজন হতে থাকুক এবং সেটার ব্যবহার নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য হোক, এই ভাবনা কাজ করে। বিষয়টি এতটাই স্পষ্ট যে জেনে-বুঝে চোখ বন্ধ করে রাখা ব্যক্তিই একমাত্র তা বুঝতে পারেন না।

আমাদের রাষ্ট্রের পরিচয় সম্পর্কে, আমাদের সকলের সামগ্রিক পরিচয় সম্বন্ধে, আমাদের রাষ্ট্রের স্বভাবের পরিচয় সম্পর্কে, আমাদের সকলের সামগ্রিক পরিচয় সম্বন্ধে, আমাদের রাষ্ট্রের স্বভাবের পরিচয় সম্পর্কে সঙ্ঘের স্পষ্ট দৃষ্টি ও ঘোষণা রয়েছে। সঙ্ঘ বিশ্বাস করে, ভারত হিন্দুস্থান, হিন্দুরাষ্ট্র। সঙ্ঘের দৃষ্টিতে 'হিন্দু' শব্দ শুধু যাঁরা নিজেদেরকে হিন্দু বলে তাদের জন্য নয়। যাঁরা ভারতের, যাঁরা ভারতীয় পূর্বপুরুষের বংশধর ও সব ধরনের বিভিন্নতাকে স্বীকার, সম্মান ও স্বাগত জানিয়ে পরস্পর মিলেমিশে দেশের বৈভব ও জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে যুক্ত হন তাঁরা সবাই ভারতীয় হিন্দু। তাদের উপাসনাপদ্ধতি, ভাষা, পানাহার, রীতিনীতি, বাসস্থান যাই হোক না কেন তাতে কোনও পার্থক্য হয় না। ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি ও সমাজ নির্ভীক হয়। এরকম ক্ষমতাসম্পন্ন লোকেরা চরিত্র সম্পন্ন হলে তারা অন্যকে ভয় দেখায় না। দুর্বল লোকেরাই নিজেদের সুরক্ষা হীনতার ভয়ের কারণে অন্যদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করে। সঙ্ঘ সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজকে এরকম বল ও চরিত্র সম্পন্ন এবং সৎভাবে তৈরি করবে, যারা অন্যকে ভয় পাবে না, অন্যকে ভয় দেখাবে না, বরং দুর্বল ও অসহায় লোকেদের রক্ষা করবে।

এই হিন্দু শব্দের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা আসলে তাকে একটি সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ করার কল্পনা যা ইংরেজদের সময় থেকে আমাদের বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই শব্দ অস্বীকার করে এমন শ্রেণীও সমাজে রয়েছে। তারা নিজেদের জন্য ভারতীয় শব্দ প্রয়োগ করেন। ভারতীয় স্বভাব, ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে চলা সভ্যতাগুলিকে কিছু মানুষ ইংরেজিতে 'ইন্ডিক' শব্দে সম্বোধন করেন। যারা হিন্দু শব্দকে ভয় বা ভ্রমবশত অস্বীকার করে, তাদের জন্য সঙ্ঘের কাছে এই শব্দের বিকল্প ব্যবহার স্বীকার্য। শব্দ পৃথক হলে, পন্থ সম্প্রদায় ভিন্ন হলে, পানাহার, রীতিনীতি ভিন্ন হলে, বসবাসের স্থান ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায়, প্রান্ত বা ভাষা ভিন্ন হলে আমরা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে পবস্পর পৃথক মনে করি না। এদের সকলকে আপন মনে করেই সঙ্ঘ কাজ করে। আমাদের এই আপনত্ব, যুক্ত করার ভাবনাই রাষ্ট্রভাবনা। সেটাই হিন্দুত্ব। আমাদের এই প্রাচীন রাষ্ট্র কালোপযোগী, পরম বৈভব সম্পন্ন রূপ বাস্তবে সাকার করার লক্ষ্য, এর ধর্মপ্রাণ প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও সংবর্ধনই এই আপনত্বের কেন্দ্র ও লক্ষ্য।

ভারতকে বিশ্বের একান্তভাবে প্রয়োজন। ভারতকে নিজের প্রকৃতি, সংস্কৃতির সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর অবশ্যই দাঁড়াতে হবে। এজন্য রাষ্ট্র সম্বন্ধে স্পষ্ট কল্পনা ও গৌরবের ভাব মনে নিয়ে সমাজের সর্বত্র সদ্ভাব, সদাচার ও সমরসতার ভাবনা সুদৃঢ় করা প্রয়োজন। এইসব প্রচেষ্টায় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এবং থাকবে। এর জন্য উপযোগী অনেক যোজনাকে যশস্বী করার জন্য সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সচেষ্ট। প্রত্যেক স্বয়ংসেবককেই সময়ের আহ্বান স্বীকার করে কাজ করতে হবে। কিন্তু এই সময়ের চাহিদা তখনই সময় মতো পূরণ হবে যখন আমরা এই কাজের দায়িত্ব কোনও ব্যক্তি বা সংগঠনের উপর দিয়ে, স্বয়ং দূর থেকে দেখার স্বভাব ত্যাগ করব। রাষ্ট্রের উন্নতি, সমাজের সমস্যার সমাধান ও সংকটের উপশম করার কাজ অন্যের উপর চাপানো যায় না। মাঝে মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজ অবশ্যই কেউ-না-কেউ করবেন, কিন্তু যতদিন না জাগ্রত জনগণ, স্পষ্ট দৃষ্টি, নিঃস্বার্থ প্রকৃত পরিশ্রম ও দুর্ভেদ্য একতার সঙ্গে বজ্রশক্তি সম্পন্ন হয়ে এরকম প্রয়াসে স্বয়ং লিপ্ত হয়, ততদিন সম্পূর্ণ ও চিরস্থায়ী সাফল্য অর্জন সম্ভব হবে না।

এই কাজের জন্য সমাজে পরিবেশ সৃষ্টিতে কার্যকর্তা নির্মাণের কাজ সঙ্ঘ করে চলেছে। সেই কার্যকর্তাদের দ্বারা সমাজে চলা সমস্ত কার্যকলাপ ও তার পরিণাম আজ এটা প্রমাণ করছে যে, আমাদের আত্মীয়-পরিজন, আমাদের এই দেশ তথা বিশ্বকে সুখী করার এটাই সঠিক পথ। আপনাদের সকলের প্রতি এই আহ্বান যে সাম্প্রতিক সময়ের চাহিদাকে ভালো ভাবে আত্মস্থ করে আমরা সবাই যেন এই সুন্দর ও পবিত্র কর্মের সহযোগী হই।

''যুগ পরিবর্তন কী বেলা মেঁ হম সব মিলকর সাথ চলেঁ
দেশধর্ম কী রক্ষা কে হিত সহতে সব আঘাত চলেঁ
মিলকর সাথ চলেঁ মিলকর সাথ চলেঁ''।।

।। ভারত মাতা কী জয়।।

(বিজয়াদশমী উৎসব উপলক্ষ্যে নাগপুরে প্রদত্ত ভাষণ)

ভারতে স্বর্ণযুগের আভাস

এক সময় রাজনীতি ছিল উন্নয়নের জন্য দৌড় ঝাঁপ। কে কতটা জনগণের কাছের হবে ও কে কত সম্মানের ব্যক্তি হতে পারে— সেই লক্ষ্যে পাঁচবছর কঠোর পরিশ্রম। জনগণের করের টাকায় উন্নয়ন হয়। কোনো এক জনপ্রতিনিধি নামক ব্যক্তির মাধ্যম দিয়ে সেই উন্নয়ন নর্মালি জিরো, কিন্তু খাতায় কলমে হিরো। বলা বাহুল্য, দেশের কিছু রাজ্যে সামাজিক উন্নয়ন না হয়ে হচ্ছে শাসক দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের ও আমলাদের। পরিস্থিতি আজ এই পর্যায়ে পৌঁছেছে আই পি এস-দের পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। পাশাপাশি ছাড় পাচ্ছেন না একদা দামি অর্থমন্ত্রীও। উন্নয়নের নামে শুধু ঘোটালা ও কেলেঙ্কারি। গণতান্ত্রিক দেশে সাধু ও ডাকাত দুজনেই আইনি লড়াইয়ের সুযোগ পায়। প্রমাণ রয়েছে পেটের দায়ে কোনো শিশু খাবার চুরি করে খেলে তাঁকে হাত পা বেঁধে গণধোলাই দেন সুশীল সমাজ, আবার শিশুশ্রম যেখানে নিষিদ্ধ সেই শিশুটিকে হাড়ভাঙা খাঁটুনির পর দেওয়া হয় বাসি খাবার। এই নিয়ে কারোরই কোনো হেলদোল নেই। কিন্তু এই উচ্চপদে যাঁরা কোটি কোটি অর্থ আত্মসাৎ করছেন তাঁরা নিরাপত্তা থেকে দামি আইনজীবী বেমালুম পেয়ে যান। না জোটে গণধোলাই, না দেওয়া হয় বাসি খাবার। প্রশ্ন, তাঁরা সমাজকে ও দেশকে কী দিয়েছেন? দেশের সর্বোচ্চ পদে বসার স্বীকৃতি পেয়ে সমাজকে আলোর পথ না দেখিয়ে অর্থ তছরুপের নজির গড়ে উঠতি প্রজন্মকে এক অন্ধকারের পথ দেখাচ্ছেন। খবরের কাগজে, বৈদ্যুতিন চ্যানেলে এদের নিয়েই তরজা চলে। চাকরির পরীক্ষায় অবশ্যই এদের নামে জেনারেল নলেজে প্রশ্ন থাকে। পরীক্ষার্থীদের এদের নাম মনে রাখতে হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতির নাম কী? ভারতের অর্থমন্ত্রীর নাম কী? অনেক ছাত্র-ছাত্রী বলতে পারে না। কিন্তু কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎকারীদের নাম বলতে পারে।

বিশ্লেষকেরা বলেছেন, আমাদের দেশে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির ফান্ডে যে অর্থ জমা আছে তার থেকে অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলির ফান্ডে দ্বিগুণ অর্থ রয়েছে। এক পরিসংখ্যানে বেরিয়েছিল। এদিকে সর্বহারার দল বলে যে দলের নেতারা চিৎকার করেন তাদের দল দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

সেদিনের খবরে আকর্ষণীয় সংবাদ প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীকে শাড়ি উপহার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। 'অতিথি দেবায় ভবো'--- বেসিক্যালি তিনি কি ওই উপহার মন থেকে দিয়েছেন? না, জনগণ বলছে, ঠেলার নাম বাবাজী। আসলে আইপিএস রাজীব কুমার ও কানুদার প্রাক্তন স্ত্রীকে যাতে না ধরা হয় সেইজন্যই তিনি ছুটেছেন দিল্লিতে। ১৮ সেপ্টেম্বর মোদীজীর সঙ্গে বৈঠক করেন। মোদীজীও জানেন না কী বিষয় নিয়ে এসেছেন। অধীরবাবু বলছেন, উন্নয়ন নয়, সেটিং। মোদীর দরবারে মমতা। এতোই যখন আপনার কৌতূহল সঙ্গে আপনার যাওয়া উচিত ছিল, সঙ্গে মহম্মদ সেলিমবাবুকে নিতেন। অধীরবাবুকে বলে রাখি, মোদী ও এনডিএ সরকারের হাত থেকে দুর্নীতিগ্রস্তদের বাঁচা খুবই কঠিন। এটা ইউপিএ-র আমল হলে পার পেয়ে যেত, কারণ সোনিয়া, রাহুল ও বঢরার কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির খোঁজ মমতার জানা আছে সেইজন্য সোনিয়া মমতাকে নিয়ে অত ঘাঁটান না।

তাই, অধীরবাবুর মন্তব্য একেবারে বোগাস। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রকাশ্য জনসভায় নরেন্দ্র মোদীর নামে কত বাজে বাজে মন্তব্য করেছেন মমতা ব্যানার্জি, এমনকী আপনিও করেছেন, মনে পড়ে? আসলে একই বৃন্তে দুটি কুসুম 'কংগ্রেস ও তৃণমূল'। সুতরাং ভাষা ও রুচি কি বদলাবে? ইদানীংকালে ভাষাও লাগাম ছাড়া হয়ে যাচ্ছে একদা বিখ্যাত রবিনহুডের। সুতরাং, বঙ্গপ্রদেশে এনআরসি হবেই। তার আগের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে ভোটার নামের সঙ্গে আধার সংযুক্তিকরণ। দ্বিতীয়ত, বঙ্গে সারদা নারদা কেলেঙ্কারির নেতা-মন্ত্রী নায়ক-নায়িকা আমলারা যতই দিল্লি দৌড়াক পার পাবেন না। ভারতে স্বর্ণযুগ আসবে মোদীজীর আমলেই। এই দৃষ্টিতে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে বসবাসরত হিন্দু সংখ্যালঘুদের বলছি, তোমরাও জাগো এবং অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে নেমে পড়ো, ভারতবর্ষ পাশে আছে মানে মোদী সরকার পাশে আছে। এছাড়া 'এক দেশ এক ভাষা' নিয়েও নোংরা রাজনীতি করছেন বিরোধী আঞ্চলিক দলগুলি। অমিত শাহজী একবারের জন্য বলেননি যে, মাতৃভাষা বাদ যাবে। দক্ষিণ ভারতে যারা ঘুরতে বা চিকিৎসার জন্য যান সেখানে তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো সেখানকার স্থানীয় ভাষার বাইরে হিন্দিভাষা বললে দোকানদার ও জনগণ উত্তর দেন না। এই কারণেই হিন্দিভাষাকে বাধ্যতামূলক করা। হিন্দি ছবি দেখতে পারি কিন্তু হিন্দি ভাষা শিখতে আপত্তি কেন? তাহলে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির আজ বেহালদশা কেন? এই প্রশ্ন রইল বঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের কাছে যারা প্রশ্ন তুলেছেন হিন্দি ভাষা কেন শিখব?

—রাজু সরখেল,
দিনহাটা, কোচবিহার।

চিঠিপত্র

বাজার ধরার কৌশল

সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়র নিগ্রহের ঘটনায় শিল্পী সুমন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, বাবুল মুসলমান বিদ্বেষী। সুতরাং যাদবপুরে যা হয়েছে ঠিকই হয়েছে। সুমন এমন একজন শিল্পী যিনি বাজার ধরার জন্য যে কোনও কাজ করতে পারেন। নব্বইয়ের দশকে আকস্মিক উত্থানের পর ওই দশকেরই শেষের দিকে সুমনের গানের বাজার পড়তে থাকে। কয়েক বছর পর পশ্চিমবঙ্গে আর কোনও সম্ভাবনা নেই দেখে সুমন বাংলাদেশের বাজার ধরতে প্রবৃত্ত হন। যার জন্য তিনি তসলিমা নাসরিনকে নির্বিচারে ব্যবহার করেন এবং ধর্মত্যাগ করে মুসলমান সেজে বাংলাদেশের শ্রদ্ধেয় শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিনের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু এত কিছু করেও কিছু হলো না। তাই সুমন একবার তৃণমূল ত্যাগ করে আবার তৃণমূলি সেজেছেন। মুসলমান বাজার ধরার জন্য মুসলমান-প্রেমের নাটক করছেন। এমন একজনকে শিল্পী ভাবতেও লজ্জা হয়।

—নবারুণ সেনগুপ্ত,
বিরাটি।

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

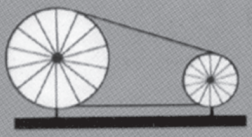

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
— দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

আধুনিক নারীর মনের কথা জানতেন রবীন্দ্রনাথ

অঙ্গনা

মালিনী চট্টোপাধ্যায়

''আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সঙ্কটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।''

রবীন্দ্রনাথ ও মৈত্রেয়ীদেবী

চিত্রাঙ্গদাকে দিয়ে বলিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভাবতে বিস্ময় জাগে আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে (প্রথম প্রকাশকাল ১২৯৯, নৃত্যনাট্যরূপে প্রকাশ ১৩৪৩) রবীন্দ্রনাথ কীভাবে আধুনিক নারীর মর্মকথা বসিয়েছিলেন নায়িকার মুখে। সে বিস্ময় খানিকটা অপনোদিত হয় রবীন্দ্রনাথের পরিবারের মেয়েদের জীবনকথা পাঠে। তাঁরা সবাই সুন্দরী, ধনী পিতার সন্তান। সব বিষয়ে নিজেদের যোগ্য করে না তুললেও তাঁদের জীবন আপন গতিতে এগিয়ে যেত। তবু সকলে প্রবল অধ্যবসায়ে নিজেদের সর্ববিদ্যায় পারদর্শিনী করে তুলেছিলেন।

স্বর্ণকুমারীদেবী, প্রতিভাদেবী, সরলাদেবী চৌধুরানী, ইন্দিরাদেবী— রবীন্দ্রনাথের ভগিনী, ভাগিনেয়ী ও ভ্রাতুষ্পুত্রীরা সবাই যেন নীরবে পুরুষদের বলেছেন, 'পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে সে নহি নহি', ভাবলে চমকে উঠতে হয় তাঁরা কতদূর আধুনিক ছিলেন।

এযুগে মেয়ে বলে সন্তানকে অবহেলা অধিকাংশ পিতামাতা করেন না। প্রায় সকলেই পরম মমতায় সন্তানকে লেখাপড়া শেখান। যদি কন্যাসন্তানের সঙ্গে একটি পুত্রসন্তানও থাকে তাহলে অবশ্য চিত্রটি সামান্য আলাদা, পুত্রটিই অধিক মনোযোগ ও সুযোগ-সুবিধা পায়। পরিবারটি গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা হলে এসবক্ষেত্রে কন্যাসন্তানটিকে যত দ্রুত সম্ভব শ্বশুরালয়ে পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে পরিবার পরিজন, বিয়ে ঠেকিয়েও বিশেষ লাভ হয় না।

জীবনে সর্বদা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা জারি রাখতে হবে। থেমে গেলেই চারপাশের লোকের অবজ্ঞা-অবহেলা হবে সঙ্গী। কারণ শুধু নারী বলেই নারীকে শ্রদ্ধা কজন করে? সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবে, মানুষকে মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করতে শিখবে, এই অপেক্ষায় না থাকাই ভালো। রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছিলেন, ''আর কেউ আমাদের হাতে নেই। আমরা শুধু নিজেরাই নিজেদের হাতে আছি।'' সুতরাং একজন নারীর পক্ষে যা-যা করা সম্ভব সবই আমাদের করতে হবে। নইলে এযুগে জন্মেও যদি আমরা আলস্যে দিন কাটাই তবে তার চেয়ে লজ্জার বিষয় আর বেশি কিছু আছে কি? ভোরবেলা শয্যাত্যাগ করে সংসারের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করা যে সমস্ত নারীর দিবারাত্রির কাব্য তাঁদের কাছে নিজের জন্য সময় বার করার স্বপ্ন দেখাও অসম্ভব মনে হতে পারে। কিন্তু এছাড়া তো উপায় নেই। নিজে স্বাবলম্বী না হলে সমাজের জন্যও কিছু করা যায় না। পিতা, মাতা বা স্বামী, সন্তানের কষ্টার্জিত রোজগার পরের জন্য ব্যয় করতে কারই বা ভালো লাগে? শরৎচন্দ্র এক নারীকে চিঠিতে লিখেছিলেন, ''অনেক পরিশ্রমই বৃথা যায় বলিয়া প্রথমে মনে হয় বটে, কিন্তু কোনও পরিশ্রমই কোনোদিন সত্যসত্যই নষ্ট হয় না —আর একভাবে ফিরিয়া আসে।...সংসারের কাজে নাকি তোমার সময় খুব কম। হইবারই কথা। তবুও এই কথাটাই সত্য যে অনবকাশের মধ্যেই হয়তো বা কখনো কখনো সময় পাওয়া যায়, কিন্তু অবকাশের মধ্যে কোনোকালে কাজ করিবার অবকাশ পাওয়া যায় না।'' বস্তুত অসুবিধার মধ্যে সফল হওয়ার বাসনা আরও বৃদ্ধি পায়, যখন অনন্ত অবসর, তখন মন সাধারণত ঘুমিয়ে পড়ে, সফল হওয়ার ইচ্ছাটুকু অন্তর্হিত হয়।

তাই সমস্যা সময় নয়। ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্যে অনেক অসম্ভবই সম্ভব হয়। ❙

দীপাবলীর শুভেচ্ছা সহ—

SUNITA JHAWAR

কাউন্সিলার ও বিজেপি নেত্রী

৪২ নং ওয়ার্ড, কোলকাতা পুরসভা

KISHAN JHAWAR

উত্তর-পশ্চিম কোলকাতা জেলা সভাপতি

বিজেপি

Mobile : 9830050425

Lotus Rang Udyog

DEALS IN - DYES & CHEMICALS

26/4-A, Armenian Street.
Kolkata - 700 001

Mobile No. 9830014898

2268-2717, 2218-2931

E-mail : ranjeet.Lunia@yahoo.in

Wish you very happy :

BISHWANATH DHANANIA

With Best Compliment-

Ecomoney Insurance Brokers Pvt. Ltd.

শ্যামপুকুরের মা ভবতারিণী

সপ্তর্ষি ঘোষ

উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর অঞ্চলে শ্যামপুকুর থানা সংলগ্ন ২/২এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রিটস্থ শতাধিক বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত 'ভবতারিণী কালীমন্দির' কলকাতার প্রাচীন দেবালায়গুলির মধ্যে অন্যতম। একদা এই এলাকাটি 'কম্বুলিটোলা' নামে পরিচিত ছিল। সেজন্য প্রবীণ ব্যক্তিরা ভবতারিণী কালীমন্দিরকে কম্বুলিটোলা কালীবাড়ি নামে অভিহিত করেন। জগজ্জননী মা এখানে ভবতারিণী রূপে বিরাজিতা।

এবার মন্দির প্রতিষ্ঠার নেপথ্য কাহিনি উল্লেখ করা যাক। বঙ্গদেশে তখন মুর্শিদকুলি খাঁ-র শাসন। তুলসীরাম ঘোষ ছিলেন নবাবের দেওয়ান। তুলসীরামের পৌত্র হরপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন শক্তিসাধক। কলকাতায় বাসকালে হরপ্রসাদ একরাত্রে স্বপ্নাদেশ পান, মা ভবতারিণীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার। ভক্তপ্রবর হরপ্রসাদ কালবিলম্ব না করে বলরাম ঘোষ স্ট্রিটে নিজেদের বসত বাড়ির সামনেই মন্দিরের জন্য এক বিঘা জমি কেনেন। শুভদিন দেখে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হয়ে যায়। মন্দির নির্মাণের কাজ চলতে থাকে। হরপ্রসাদ অবশ্য জীবদ্দশায় মন্দির সম্পূর্ণ দেখে যেতে পারেননি। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণের পর তাঁর সহধর্মিণী দয়াময়ী দাসী মন্দিরের কাজ শেষ করার যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দয়াময়ী দাসী ছিলেন একজন নিষ্ঠাবতী, ধর্মপ্রাণা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না রমণী। মন্দির নির্মাণের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য তিনি তাঁর শ্বশুর ভবানীপ্রসাদ ঘোষের ঢাকা শহরে বুড়িগঙ্গাতীরের বসতবাড়ি ও সংলগ্ন জমি বিক্রি করে সাতাশ হাজার পাঁচশো টাকা সংগ্রহ করেন। এছাড়া নিজের যাবতীয় অলংকার এবং মূল্যবান আসবাবপত্র বিক্রি করে প্রয়াত স্বামীর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে ব্রতী হন। মা ভবতারিণীর মূল মন্দির এবং তার পাশে দুটি শিবমন্দিরের নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১২৯৪ বঙ্গাব্দের শেষের দিকে। ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ৫ বৈশাখ বাসন্তী পঞ্চমীতে মা ভবতারিণী এবং 'হরপ্রসন্ন' ও 'হরেশ্বর' নামক দুই শিবলিঙ্গের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। তদবধি বাসন্তী পঞ্চমীর পুণ্য তিথি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়।

ভবতারিণী কালীমাতার মন্দিরের প্রতিষ্ঠার পর ভক্তিমতী ও স্নেহশীলা দয়াময়ী লিখিত অর্পণনামায় তাঁর একমাত্র পুত্র সারদাপ্রসাদকে সমস্ত সম্পত্তি-সহ ভবতারিণী মন্দিরের সেবায়েত নিযুক্ত করে যান। তদবধি সারদাপ্রসাদের উত্তরসূরিরা মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবায়েতের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। মন্দিরের ব্যয়ভার নির্বাহ হয় সেবায়েতদের স্বোপার্জিত অর্থে।

ভবতারিণীর মূল মন্দির, সন্নিহিত দুটি শিবমন্দির এবং নাটমন্দির— দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত দক্ষিণমুখী নবরত্ন মন্দির। মা ভবতারিণীর মূর্তি ও শিবলিঙ্গ দু'টি কালো কষ্টিপাথর দিয়ে তৈরি। মন্দিরে শালগ্রাম শিলা, গণেশ, সিংহ ও শিয়ালের মূর্তি আছে। ভবতারিণীর বিগ্রহ ও শিবলিঙ্গ দুটি শিল্পী বাড়িতেই তৈরি করেছিলেন। শোনা যায় মাতৃমূর্তি ও দুটি শিবলিঙ্গ তৈরি করার পরে কিছু কষ্টিপাথর থেকে যায়। সেই বাড়তি কষ্টিপাথর দিয়ে তৈরি হয়েছে গণেশ, সিংহ এবং শিয়ালের তিনটি মূর্তি। মা ভবতারিণীর পাদদেশে রয়েছেন মহাকাল, তাঁর অবয়ব শ্বেতপ্রস্তরে নির্মিত। এই পাথর আনা হয়েছিল জয়পুর থেকে।

মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেই একটা আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের স্পর্শ পাওয়া যায়। মাধুর্যময় সুখানুভূতি ভক্তকে মোহিত করবে। মাতৃমূর্তির সামনে দাঁড়ালে মায়ের ভুবনভোলানো রূপের আলোয় ভক্তহৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। চোখ হয়ে ওঠে সিক্ত। অপরূপ দক্ষিণাকালী মূর্তি দিগম্বরী ছিলেন। বর্তমানে অবশ্য তিনি বস্ত্রপরিহিতা। ঘোমটাপরা স্নেহময়ী জননীবেশে মা ভবতারিণী মন্দির আলো করে ভক্তদের কৃপাবর্ষণ করছেন।

কালীপূজা, রটন্তীকালী পূজা, ফলহারিণী কালীপূজা এবং শিবরাত্রিতে মহা সমারোহে পূজা হয় ভবতারিণী মন্দিরে। ভক্তিপ্রাণ নর-নারীর ভিড়ে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে মন্দির প্রাঙ্গণ। দুর্গাপূজার মহানবমীতে ভবতারিণী কালীমাতা 'দুর্গতিনাশিনী দুর্গা' রূপে পূজিতা হন। মা ভবতারিণীর পায়ে ভক্তির অঞ্জলি নিবেদন করে হৃদয়ে অপার শান্তি অনুভব করে মন্দিরে আসা পুণ্যার্থীরা। ভবতারিণী মা জাগ্রতা, এ বিশ্বাস বহু মানুষের। আর সেই আকর্ষণে শুধু এ রাজ্যেই নয়, ভারতের নানা প্রান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ মা ভবতারিণীর কৃপালাভের জন্য এই মন্দিরে ছুটে আসেন। ▮

রামপ্রসাদের গানে মা কালী জীবন্ত হয়ে উঠতেন

অরুণ মুখোপাধ্যায়

রামপ্রসাদ এক ধনাঢ্য জমিদারের বাড়িতে কাজ পেলেন। মুহুরির কাজ। রামপ্রসাদ টাকা পয়সার হিসেব রাখতে রাখতে হিসেবের খাতায় মা কালীর গান লিখে ফেললেন। যারা রামপ্রসাদের সমালোচক তারা মনিবের কানে ব্যাপারটি তুলল। ভাবল, মনিব রামপ্রসাদকে কাজে ফাঁকি দেবার কারণে তিরস্কার করবেন। এমনকী কাজও চলে যেতে পারে।

কিন্তু কিছুই হলো না। মনিব রামপ্রসাদকে ডেকে পাঠালেন। হিসেবের খাতা দেখতে চাইলেন। রামপ্রসাদ সেই খাতা মেলে ধরতেই মনিব দেখেন খাতায় কালীর সুন্দর পদ লেখা। 'আমায় দে মা তবিলদারি।/ আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।।/ পদরত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে,/ ইহা আমি সইতে নারি।/ ভাঁড়ার জিম্মা আছে যার, / সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।।' মনিব হিসেবের খাতা উলটে পালটে দেখলেন। প্রতি পাতায় 'শ্রীদুর্গা', 'শ্রীদুর্গা' নাম লেখা আছে। খাতার শেষ পাতায় রয়েছে এই গান। আবার চোখ বোলালেন। মুহুরি রামপ্রসাদ গান লিখেছেন, 'শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা রাখো তাঁরি।/ অর্ধ অঙ্গ জায়গির, তবু শিবের মাইনে ভারী।/ আমি বিনা মাইনায় চাকর কেবল চরণধুলার অধিকারী।।' মনিব পদ পড়লেন।

রামপ্রসাদকে তিরস্কার তো দূরের কথা, তাঁর জন্য মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তির ঘোষণা করলেন।

তিনি বুঝলেন রামপ্রসাদ অন্য মানুষ। মুহুরির কাজ রামপ্রসাদের জন্য নয়। তিনি রামপ্রসাদকে বললেন, 'তুমি যতকাল এই সংসার কাননে বিচরণ করবে ততকাল তোমাকে ৩০ টাকা মাসিক বৃত্তি প্রদান করব। তুমি আর এখানে থেকো না। বাড়ি গিয়ে নিজের কাজ করো।'

রামপ্রসাদ ফিরে এলেন হালিশহরে। নিজের পৈতৃক ভিটেয়। হালিশহরের প্রাচীন নাম কুমারহট্ট। শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরীর জন্মভূমি কুমারহট্টেই রামপ্রসাদ জন্ম নিয়েছিলেন। পিতা রামরাম সেন ও মাতা সিদ্ধেশ্বরী দেবীর এই সন্তান বালক বয়স থেকেই আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। কলকাতা থেকে ফিরে রামপ্রসাদ শুরু করলেন মা কালীর সাধনা। শুদ্ধ শক্তি ভক্তিকে অবলম্বন করে রামপ্রসাদ গানের সমুদ্রে ডুবে

গেলেন। গান লিখলেন, 'আমি তাই অভিমান করি।/ আমায় করেছ সংসারী।।/ অর্থ বিনা, ব্যর্থ যে, এ, সংসারে সবারি।' মায়ের রূপ নিয়ে লিখলেন, 'করালবদনা কালী কলুষহারিণী।/ সংসার সাগরে ঘোরে নিস্তারতারিণী'। কুমারহট্ট হালিশহরে সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশের রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর এক সাধনপীঠে রামপ্রসাদ তাঁর সাধনভজন শুরু করলেন।

বাবা-মায়ের ইচ্ছেয় কম বয়সে বিয়ে করেছেন। রোজগার তেমন আহামরি কিছু নয়। এসব কথা গানের ভাষায় চলে এল। রামপ্রসাদের স্ত্রী স্বামীর মতোই ভক্তিমতী ছিলেন। তাঁর প্রতি স্বপ্নাদেশ আসে রামপ্রসাদ যেন কাব্য রচনা করেন। অলৌকিক, অসাধারণ শাক্ত কবিতার শব্দ অনায়াসে রামপ্রসাদের কাছে চলে আসে। মুখে যা উচ্চারিত হয় তাই লিখে ফেলেন। মা কালীর কাছে নিজেকে নিবেদন ও সমর্পণ করেন। দেবীর কাছেই রামপ্রসাদের যত মান, অভিমান, দুঃখ, আক্ষেপের প্রকাশ। কালীনামই তাঁর সারবস্তু।

তন্ত্রসাধক কালীর বেটা রামপ্রসাদ নিজেই জানেন না কালী কেমন? ষড়দর্শনে তাঁর দর্শন পাওয়া যায় না। তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে সদা যোগী করে মনন। তাঁর বিশ্বাস 'কালীনাম জপ কর, যাবে কালীর কাছে।/ কালীভক্ত, জীবন্মুক্ত, যে ভাবে যে আছে।' আবার ভক্তদের নির্দেশ দেন, 'কালী কালী বল রসনা।/ কর পদধ্যান, নামামৃত পান,/ যদি হতে প্রাণ, থাকে বাসনা।।' কালীতেই যাঁর মন পূর্ণ, তাঁর মন কখনো কি সংসারের তুচ্ছ চাওয়া পাওয়ায় প্রভাবিত হয়? মনে তাঁর দয়া ছিল বলে কাজে দাতা ছিলেন। কারও অভাবে নিজের না থাকা সত্ত্বেও যা ছিল তাই দিয়ে রামপ্রসাদ মুক্ত হস্তে দান করে গেছেন। তাই তো পদ লিখেছেন, 'তুমি এ ভালো করেছ মা, / আমারে বিষয় দিলে না।/ এমন ঐহিক সম্পদ কিছু,/ আমারে দিলে না।' অসাধারণ স্বীকারোক্তি। অসামান্য প্রণাম নিবেদন। আমরা নিজের মানুষের কাছে যেভাবে নিজেকে উজাড় করে দিই রামপ্রসাদও সেইভাবে মায়ের কাছে নিজেকে উজাড় করেন।

রামপ্রসাদকে নিয়ে অনেক গল্প। রামপ্রসাদ গঙ্গাস্নানে যাচ্ছেন। এক রমণী এসে বললেন, 'বাবা, তোমার কণ্ঠে শ্যামামায়ের গান শুনব।' রামপ্রসাদ বললেন, 'মা, আমি গঙ্গাস্নান সেরে আসি। তারপর আপনাকে গান শোনাব।' গঙ্গাস্নান সেরে ফিরে রামপ্রসাদ দেখেন ওই রমণী নেই। মায়ের পুজোয় বসে তিনি দৈবকৃপায় দেখতে পেলেন, তাঁর সামনে কাশীর মা অন্নপূর্ণা দাঁড়িয়ে। মা বলছেন, 'বাবা প্রসাদ, তোমার গান শোনার জন্যই তো আমি কাশী থেকে এসেছিলাম।'

হায়! হায়! রামপ্রসাদ মনে ব্যথা পেলেন। ঠিক করলেন, কাশী যাবেন। পায়ে হেঁটে কাশী যাবার প্রস্তুতি নিলেন। ত্রিবেণীর ঘাটে বিশ্রামরত অবস্থায় রামপ্রসাদ শুনতে পেলেন কাশীশ্বরীর কণ্ঠ। 'প্রসাদ, কাশী আসার দরকার নেই। আমি কি শুধু কাশীতেই আছি? তুমি আমার ভক্ত। আমি তোমার হৃদয় বেদিতে আছি। ত্রিবেণীর এই পুণ্যঘাটে তুমি আমাকে গান শোনাও।' রামপ্রসাদ গান বাঁধলেন। 'আর কাজ কি আমার কাশী?/ মায়ের পদতলে পড়ে আছে/ গয়াগঙ্গা বারাণসী।' দিন যায়। আর রামপ্রসাদ নিজেকে ডুবিয়ে দেন বীরাচারী তপস্যায়, মা কালীর সাধনায়।

হালিশহরে প্রচণ্ড ঝড় হয়েছে। রামপ্রসাদের ভিটের বেড়া ভেঙে গেছে। আর্থিক সমস্যায় রয়েছেন বলে ছোটো মেয়ে জগদীশ্বরীকে সঙ্গে নিয়ে বেড়া বাঁধতে বসেছেন। বাবা ও মেয়ে দুজনে বেড়ার দুদিকে বসে বেড়া বাঁধছেন। রামপ্রসাদ নিজের মনে মায়ের গান গেয়ে যাচ্ছেন। মেয়ের কি আর বেড়া বাঁধতে ভালো লাগে? সে একবার বান্ধবীদের সঙ্গে খেলার জন্য মাঠে খেলতে চলে গেল। রামপ্রসাদও খেয়াল করেননি।

মেয়ের যখন টনক নড়েছে, এসে দেখে, বেড়া বাঁধা শেষ হয়ে গেছে। বাবাকে জিজ্ঞাসা করে, 'বাবা! তুমি একা একা কী করে বেড়া বাঁধলে বাবা?' রামপ্রসাদ বলেন, 'কেন মা? তুই যে আমাকে ওদিক থেকে দড়ির খুঁট এগিয়ে দিচ্ছিলি?' জগদীশ্বরী তখন সব কথা জানায়। রামপ্রসাদ বোঝেন মা কালী তাঁর সন্তানের কষ্ট হচ্ছে দেখে জগদীশ্বরীর বেশে বেড়া বেঁধে গেছেন। গান লিখলেন রামপ্রসাদ। 'যেই ধ্যানে একমনে,/ সেই পাবে কালিকা তারা/ বের হয়ে দেখ কন্যারূপে, / রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া।'

কলকাতার চিৎপুরে চিতে ডাকাতের কালী দুর্গারূপে দেবী চিত্রেশ্বরী। গঙ্গার ধারে অবস্থিত মন্দির। রামপ্রসাদ গঙ্গার বুকে নৌকায় চেপে যাচ্ছেন। দেবীর পাশ দিয়ে যাবার সময় রামপ্রসাদ গান ধরলেন 'মা তারিণী শঙ্কর বৈরাগী তোর নাং'। দক্ষিণমুখী দেবীর মুখ ঘুরে গেল পশ্চিমে। রামপ্রসাদ ভয় পেলেন। গান শুনে মা কি রাগ করেছেন? 'নাং' শব্দে দেবী কি আহত হয়েছেন? আবার গাইলেন, 'মা তারিণী গো শঙ্করী ভবানী তোমার নাম।' দেবীর আদেশ শোনা গেল। 'প্রসাদ। প্রথমে গাওয়া গানটাই গা।' মা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। রামপ্রসাদের গানে, আকুলতায়, ভক্তিতে। এই গল্প দেবী সর্বমঙ্গলাকে নিয়ে শোনা যায়। দেবী সর্বমঙ্গলার মন্দিরে আবার রামপ্রসাদের গান শুনে দেবীর পশ্চিমমুখী হওয়ার গল্পের কথা প্রস্তর ফলকে উল্লেখ আছে। মূলাজোড়ে দেবী ব্রহ্মময়ী কালীর পশ্চিমমুখী হওয়ার নেপথ্যেও রামপ্রসাদের গানের কথা শোনা যায়।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের ভক্ত ছিলেন। তাই নিজের রাজসভায় রামপ্রসাদকে অন্যতম সভাকবি রূপে আদরে বরণ করে নিয়েছেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করার জন্য রামপ্রসাদ যাচ্ছেন। পথে ডাকাতদের কবলে পড়লেন। রণ ডাকাতের দল রামপ্রসাদকে ধরে বেঁধে নিয়ে এল। মা কালীর সামনে রামপ্রসাদের বলি হবে। নরবলি দেওয়া তখন ডাকাতদের একটি প্রথা ছিল। মা কালীর সামনে কালীর বেটা রামপ্রসাদ অবিচলিত চিত্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মৃত্যুকে তিনি ভয় পাননি। তিনি মা কালীর গান গাইলেন। 'তিলেক দাঁড়া ওরে শমন, বদন ভরে মাকে ডাকি।/ আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী,/আসেন কি না আসেন দেখি রে।' ডাকাতরা চমকে গেল। তারা দেখল রামপ্রসাদের গলায় কালীর গান শুনে কালীমায়ের মূর্তি দুলে উঠছে। ডাকাতরা রামপ্রসাদের কাছে ক্ষমা চাইল।

মা কালীর কাছে রামপ্রসাদ শিশুর মতো আত্মসমর্পণ করতেন। রামপ্রসাদের কবিতায় শাক্তপদ অসাধারণ গান হয়ে উঠেছে। শোনা যায়, রামপ্রসাদ নিজে মাটির কালীমূর্তি নির্মাণ করতেন। কালীপুজোর রাতে পুজো সেরে মাথায় দেবীমূর্তি নিয়ে পরদিন গঙ্গায় বিসর্জন দিতেন। তেমনই একবার রামপ্রসাদ জীবনের শেষ কালীপূজা সেরে মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তি মাথায় করে নিয়ে চললেন গঙ্গার পথে। গঙ্গাবক্ষে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে মা কালীর নামকে সঙ্গী করে চারটি গান গাইলেন। 'ওমা! আমার দফা হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে' গাইতে গাইতে গঙ্গাগর্ভে মা-কে নিয়ে জীবন বিসর্জন দিলেন। কারও মতে, রামপ্রসাদের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে প্রাণবায়ু নির্গত হয়েছিল। মহাপুরুষের মহাজীবন ত্যাগ তো মহাপুরুষের মতোই হবে। সাধক রামপ্রসাদ তো তেমন আশাই করেছিলেন। গান লিখেছিলেন, 'প্রাণ যাবার খেলা এই করো মা, / যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে।।' আবার অন্য এক গানে পাই, 'গঙ্গা যদি গর্ভে টানে, লইল এই ভূমি।/ কেবল কথা রবে, কোথা রব, কোথা রবে তুমি।।' শ্যামা মা তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করেছিলেন।

এই সেই রামপ্রসাদের ঘাট। যেখানে রামপ্রসাদ তাঁর আরাধ্যা কালীকে নিয়ে গঙ্গাগর্ভে চলে গিয়েছেন। চললাম রামপ্রসাদের কালীমন্দিরে। একতলা মন্দির। গর্ভগৃহে জগদম্বা মা জগদীশ্বরী কালীর অবস্থান। মন্দিরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে ডানদিকে সাধক রামপ্রসাদের সাধনপীঠ পঞ্চবটী ও পঞ্চমুণ্ডাসন। লাগোয়া যে শিবমন্দির রয়েছে ওখানেই মা জগদীশ্বরী কন্যার বেশে এসে রামপ্রসাদকে বেড়া বাঁধায় সাহায্য করেছিলেন। একটি শিবলিঙ্গ, বৃষমূর্তি ও ত্রিশূল রয়েছে ওই কক্ষে।

১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে রামপ্রসাদ গঙ্গাগর্ভে স্বেচ্ছায় বিসর্জিত হবার পর তাঁর সিদ্ধপীঠ ক্রমশ আগাছার জঙ্গল ও জীবজন্তুর বাসভূমিতে পরিণত হয়। হালিশহরবাসীর উদ্যোগে রামপ্রসাদের মৃত্যুর শতবর্ষ পরে তাঁর ভিটে, পঞ্চবটী ও পঞ্চমুণ্ডাসন সংস্কারের উদ্যোগ নেয় স্থানীয় পূর্ণিমা ব্রত সমিতি। রামপ্রসাদের ভিটে সংস্কার, জঙ্গল কাটার মজুরও পাওয়া যাচ্ছিল না। তারা ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু মা জগদম্বা ও সাধক রামপ্রসাদের কৃপায় পঞ্চবটী ও পঞ্চমুণ্ডাসন খুঁজে পাওয়া গেল। সেটা ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে। তারপর ঠিক হলো রামপ্রসাদের ভিটা সিদ্ধপীঠে প্রসাদ কালীর আরাধনা হবে।

ঠিক হলো বটে। কিন্তু কে পুজো করবে? হরিনাথ ভট্টাচার্য নামে এক পুরোহিত সম্মতি দিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়ে অস্থায়ী মণ্ডপ ভেঙে গেল। পুজোর উপকরণ পাওয়া গেল না। অথচ অচেনা এক নারী এসে পুজোর উপকরণ পৌঁছে দিয়ে গেল। কে এই নারী? প্রসাদ কালী নিজে নয় তো? বলির জন্য ছাগলকে খুঁজে পাওয়া গেল না। বোঝা গেল, মা বলিদান চান না। রামপ্রসাদ তো মায়ের কাছে 'ছয় রিপু'কে বধ করতেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার দিন মা জগদীশ্বরীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলে প্রতি স্নানযাত্রায় সকালবেলায় ভক্তরা গঙ্গাস্নান করে গঙ্গাজল নিয়ে এসে পুরোহিতের নেতৃত্বে মাকে স্নান করায়। গঙ্গাস্নান, শোভাযাত্রা ও মাতৃস্নান দেখতে স্নানযাত্রায় প্রচুর ভক্ত আসেন। প্রতিবছর ২৬ জানুয়ারি মা জগদীশ্বরীর পদপ্রান্তে অন্নকূট উৎসব হয়। রামপ্রসাদের ভিটেয় এই অন্নকূটই সবচেয়ে বড়ো অনুষ্ঠান। আর দীপান্বিতা কালীপুজোয় তো ভক্তের ভিড় থাকবে এ আর নতুন কথা কী! মহালয়ার অমাবস্যা, মাঘ মাসের রটন্তী কালীপূজা, ভাদ্রের জন্মাষ্টমী, আষাঢ়ে বিপত্তারিণী ও প্রতি অমাবস্যায় হালিশহরে রামপ্রসাদের কালী মন্দির উৎসবের চেহারা নেয়।

প্রতিদিন সকাল ৭-৩০ থেকে ১২টা, বিকেল ৪টে থেকে রাত ৮-৩০, (শীতে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি দুপুর ৩টে থেকে সন্ধে ৭-৩০ পর্যন্ত) মন্দিরের গর্ভগৃহ খোলা থাকে। সন্ধে ৬-৩০-এ মায়ের আরতি। প্রতিদিন পুরোহিতের নামে সংকল্প করে পুজো শুরু হয়। যাঁরা পুজো দিতে ইচ্ছুক, তাঁদের জন্য ০৩৩-২৫৮৮৪৬৯১— এই টেলিফোন নম্বরটা দিয়ে রাখলাম। যদি কাজে লাগে।

রামপ্রসাদের কালী নিয়ে লিখতে গিয়ে রামপ্রসাদের গানই মনে পড়ছে। 'ডুব দে মন কালী বলে।/হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।' আবার ওই গানটাও তো হৃদয়ে বাজে। 'কালী কালী বল রসনা।/ কর পদধ্যান, নামামৃত পান, /যদি হতে প্রাণ, থাকে বাসনা।।' ▮

কালীক্ষেত্র কলকাতা

অভিমন্যু গুহ

কলকাতা নামের উৎপত্তি নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তবে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কালীঘাট ইতিবৃত্ত' বইতে লিখেছেন--- ''কালীঘাটের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেও অনেক প্রবাদ আছে, কলিকাতা নগরীর নামকরণও এক প্রবাদ মতে কালিকাদেবীর নামের উপরই আরোপিত হইয়াছে। প্রাচীনকালেও পশ্চিম প্রদেশ হইতে হিন্দুস্থানীরা কালীঘাটে পূজা দিতে আসিতেন। তাঁহারা কালীঘাট 'কালীকাঁথা' অর্থাৎ কালীর স্থান বলিতেন। প্রবাদ মতে এই 'কালীকাঁথা' হইতেই কলিকাতা নামের উৎপত্তি। প্রবাদ কতদূর সত্য কে বলিতে পারে?'' স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, কলকাতা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত জনপ্রিয়তম প্রবাদ এটাই। যে 'পক্ষী'য়েরা বাংলা জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তুলে ভারত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন, যারা ঐতিহাসিকভাবে পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ বলে তুলে ধরতে চাইছেন তাদের কাছেও এই তথ্য অস্বস্তিকর।

কারণ বঙ্গদেশের পৌরাণিক কালীমাতাকে দেখতে দলে দলে পশ্চিম-ভারতীয়রা আসতেন এমন এক সময়ে যখন ব্রিটিশরাও কলকাতাধিকার করেনি। ভারতবর্ষের এই যে অখণ্ড রূপ, রাজনৈতিক না হলেও অন্তত সাংস্কৃতিকভাবে কালীঘাটের কালীমাতাই তার প্রমাণ।

পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে দক্ষযজ্ঞে সতীদেবী দেহত্যাগ করলে দেবাদিদেব মহাদেব তাঁর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে প্রলয়নৃত্য করতে থাকেন, তখন বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে সেই দেহ ছিন্ন ভিন্ন করলে দেহাংশ যে যে স্থানে পড়ে তা 'সতীপীঠ' হিসাবে গণ্য হয়। অখণ্ড ভারতবর্ষে সতীপীঠের সংখ্যা একান্ন অথবা বাহান্ন। এইসব মহাপীঠের মধ্যে কালীঘাট অন্যতম। কথিত আছে, সতীদেবীর ডান পায়ের চারটে আঙুলের অংশ এখানে পড়েছিল। এখানে দেবী কালিকা 'দক্ষিণা কালী' নামে সুপরিচিত, তাঁর ভৈরব 'নকুলেশ্বর' শিব নামে অভিহিত। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র থেকে অনুমান করা চলে দিল্লির সুবাদার মানসিংহের অনুদানেই ১৬০৬-০৭ সালে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। অবশ্য অনেকের মতে, মানসিংহ নয় যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের কাকা বসন্ত রায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রথম দিকের কালীমূর্তি ছিল পাথরে খোদিত। শোনা যায় ব্রহ্মানন্দ গিরি ও আত্মারাম ব্রহ্মচারী নামে দুই সেবায়েত দক্ষিণ ভারত থেকে পাথর এনে বারো হাত লম্বা, দু' হাত চওড়া একটি কালীমূর্তি খোদাই করেন তাতে। পরবর্তীকালে বড়িশা সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের হাতে এই মন্দিরের ভার চলে যায়। ১৭৪১ সালে এই পরিবার রামকৃষ্ণ মন্দিরের সনদ-পত্র লাভ করেন। কালীঘাটের হাওলা মৌজা তাঁর দখলে থাকায় তিনি 'হাওলাদার' উপাধিতে ভূষিত হন। যাঁর বংশধররা শেষ পর্যন্ত 'হালদার'-এ রূপান্তরিত

হয়ে আজও কালীঘাট মন্দিরে সেবায়েত। বর্তমান মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা ১৮০৯ সালে।

তবে শুধু কালীঘাটের জন্যই নয়, কলকাতা যে আক্ষরিক অর্থেই কালীক্ষেত্র তা বোঝা দুষ্কর নয়। কলকাতা জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন কিংবদন্তী কালী প্রতিমা ও মন্দির। নিমতলায় আনন্দময়ী কালীমন্দির, বড়বাজারে পুঁটে কালীবাড়ি, বিবেকানন্দ রোডের সন্নিকটস্থ নানেদের সিদ্ধেশ্বরী কালী, ঠনঠনিয়া সিদ্ধেশ্বরী কালী, হাতিবাগানের কাছে গুহদের কালীবাড়ি, বাগবাজারে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির, পুঁটে সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি, বৌবাজারে ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি, কপালীদের কালীমন্দির— এমনই বহু প্রসিদ্ধ কালী প্রতিমা ছড়িয়ে রয়েছে উত্তর ও মধ্য কলকাতা জুড়ে। দক্ষিণও পিছিয়ে নেই। কালীঘাট মন্দিরও দক্ষিণ কলকাতায়। এছাড়া লেক কালীবাড়ি, টালিগঞ্জ করুণাময়ী কালীমন্দিরের মতো মন্দিরগুলিরও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের কথা তো সাবরই জানা।

বাঙ্গালিদের সম্পর্কে এককালে চালু রসিকতা ছিল যে প্রবাসে কোনো বাঙ্গালি বসতি গড়লে একটা না একটা কালীমন্দির গড়বেই। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। দুর্গা কিংবা জগদ্ধাত্রীও বাঙ্গালি প্রাণের দেবী, কিন্তু কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের পূজিতা মূর্তির প্রতিই তাদের প্রাণের টান অধিক। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী কালিকা দেবী সেই অর্থে কলকাতায় অবস্থিত না হলেও তার পরশমণি কলকাতা মানুষ অনুভব করার সুযোগ পান। বৃন্দাবন বসু লেনে গুহদের যে কালীবাড়ি আছে, তার কালীমাতার নাম নিস্তারিণী। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে শিবচন্দ্র গুহ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। যে কালীমূর্তিটি এখানে আছে দক্ষিণেশ্বরের কালীমাতার সঙ্গে মুখাবয়বে তার হুবহু মিল। শুধু এই মূর্তিটি আকৃতিতেই যা খর্বাকৃতি। আসলে রানি রাসমণি নবীন ভাস্করকে দিয়ে কিছু কালীমূর্তি নির্মাণ করিয়েছিলেন। এর মধ্যে সর্বোচ্চ মূর্তিটি তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রতিষ্ঠা করেন, মাঝের মূর্তিটি বরাহনগরে গঙ্গার পাড়ে জয় মিত্রের কালীবাড়িতে প্রতিষ্ঠা পায়, আর খর্বকায় মূর্তিটি দীর্ঘকাল রাসমণির কাছে বাক্সবন্দি হয়ে পড়ে ছিল। শেষে খবর পেয়ে শিবচন্দ্র গুহ মা-কে বাক্স থেকে উদ্ধার করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়িতে তাকে প্রতিষ্ঠা দেন।

লক্ষণীয় এই মূর্তিগুলি হুবহু একই রকম দেখতে, কেবল উচ্চতাতেই যা পার্থক্য ছিল। যে কারণে জয় মিত্রের কালীবাড়ির কালীমাতাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর 'মাসি' বলে উল্লেখ করেছিলেন। নিমতলা ঘাট স্ট্রিটের কালীমন্দিরটি কালের হিসাবে যথেষ্ট আধুনিক। ১৯৩০ সালে প্রভাবতী দেবী তাঁর জমিদার স্বামী ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে এই মন্দির স্থাপন করেন। আবার বহু সুপ্রাচীন মন্দিরেরও হদিশ পাওয়া যায়। যেমন বড়বাজার অঞ্চলে পুঁটে কালীতলা। দাবি করা হয় ৯৬৪ বঙ্গাব্দে এইখানে মন্দিরে স্থাপনা হয়। বলা বাহুল্য, আধুনিক মন্দিটি বহু পরে স্থাপিত, সম্ভবত বিশ শতকের গোড়ায়। কিন্তু প্রায় পনেরোশো' বছর আগে মন্দির স্থাপনের যে দাবি, তখন আধুনিক কলকাতা শহর যার বয়স মেরেকেটে সাড়ে তিনশো বছরের অধিক নয় তার জন্মও হয়নি, তা অযৌক্তিক মনে হতে পারে। তবে এটাও ঠিক কপিল মুনির কিংবদন্তীর সঙ্গে জড়িত কলকাতা। তাই পুঁটে কালীতলা সেই কিংবদন্তীকে মান্যতা দিলেও 'কালীক্ষেত্র কলকাতা'কেও নবরূপে যেন তুলে ধরে। একইভাবে শ্রীমন্ত ডোম প্রতিষ্ঠিত বউবাজারের ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি, মন্দির গাত্রে লেখা ফলক অনুযায়ী ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ আধুনিক কলকাতা পত্তনের প্রায় দেড়শো-দু'শো বছর আগের। ঠনঠনিয়া কালীমন্দিরও ১৭০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত, স্থানীয় জমিদার শঙ্কর ঘোষ এর প্রতিষ্ঠাতা।

উত্তর-মধ্য কলকাতা জুড়ে এরকম প্রাচীন কালীবাড়ির সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতার লেক কালীবাড়ি, যার স্থাপনা স্বাধীনতা প্রাপ্তির দু'বছরের মধ্যে ১৯৪৯ সালে। অর্থাৎ প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকের মেলবন্ধনও কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাঙ্গালি দেখিয়েছে। লেক কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা হরিপদ চক্রবর্তী। তবে দক্ষিণ কলকাতা বলেই যে আধুনিকতার ছোঁয়া, তেমনও কিন্তু নয়। সাবর্ণ রায়চৌধুরীরা ১৭৬০ সালে আদি গঙ্গার পাড়ে করুণাময়ী কালীর প্রতিষ্ঠা করেছেন, যার বয়সও দেখতে দেখতে এখন ২৬০ ছুঁয়েছে। উত্তর কলকাতায় রামকান্ত বসু স্ট্রিটের পুঁটে সিদ্ধেশ্বরী কালী, কিংবা বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী কালী মূর্তিও সুপ্রাচীন। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব এই মন্দিরগুলো দর্শন করেছিলেন।

উপরোক্ত সূচির বাইরেও কলকাতায় আরও বহু কালীমন্দির রয়েছে। আসলে রামপ্রসাদ-বামাখ্যাপা-রামকৃষ্ণের প্রভাবে আপামর বাঙালি মা কালীর সঙ্গে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করেছে। আগেকার দিনে বিপ্লবীরা মায়ের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে গোরা ঠ্যাঙাতে যেত।

গরিব মানুষকে ধনসম্পদ বিলোতে সিদ্ধহস্ত সেকালের কিংবদন্তী ডাকাতেরা আগেকার দিনে সমৃদ্ধশালী গেরস্থকে বলে কয়ে যে ডাকাতি করতে যেত, তা ও মায়ের নামেই। মায়ের পায়ে জবা হয়ে ফোটাই ছিল বাঙ্গালি মনস্কাম। ■

‘আমি তোমাদেরই মাতা’

সুতপা বসাক ভড়

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ভগিনী নিবেদিতার লেখা ‘কালী দি মাদার’ পুস্তকটির প্রভাব ছিল অপরিসীম। এটি ছিল বিশেষভাবে বিপ্লবীদেরই মন্ত্রপুস্তক। শ্রী অরবিন্দ যখন বিপ্লবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেননি— মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন তিনি এই বইটি পড়েন। এই প্রসঙ্গে যিনি লিখেছেন, “I was very much enamoured at the time (when in baroda) of her book,–Kali the Mother.” আবার লিখছেন, “I had read and admired her book Kali the Mother.

আপাতদৃষ্টিতে ‘কালী দি মাদার’ বইটি কালীপূজা সম্পর্কে উচ্চ কাব্যিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণ। কালী দর্শনের মধ্যে ‘মৃত্যুদর্শন’ ছিল বিপ্লবীদের কাছে উদ্দীপনার উৎস। এই দর্শন তিনি লিখেছিলেন স্বামীজীর প্রেরণায় এবং তা এগিয়ে দেন বিপ্লবীদের মধ্যে। নিবেদিতার স্বীকারোক্তি অনুসারে ‘কালী’ পুস্তকের ‘ভয়েস অব দি মাদার’ পর্ব সম্পূর্ণরূপে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি সংকলন। এরই কিছু অংশের অনুবাদ দেওয়া হলো :

“ওঠো বৎস, জাগো! বেরিয়ে পড়ো বীরের মতো। বহন করো দায় পুরুষের মতো। করণীয় কাজ সমাধা করো পূর্ণ শক্তিতে, নির্ভয়ে। ভুলো না— আমি পুরুকে দিই পৌরুষ, নারীকে দিই নারীত্ব, জয় আমার মুঠিতে— আমি তোমাদের মাতা।”

“জীবন বিমর্ষ কিছু নয়। নিয়তি তোমার মায়ের খেলা ছাড়া আর কী! এসো, আমার সঙ্গে খেলো খানিক, যাই ঘটুক, স্ফূর্তিতে তার মুখোমুখি হও।”

“অভ্রান্ত আমার খেলা। এ খেলায় যোগ দিতে দিনের যাত্রা শুরু করো। ভেবে নাও— আমার খুশির জন্য এ পৃথিবীতে তুমি এসেছ, যখন রাত্রি ঘনাবে, চরিতার্থ হবে আমার আকাঙ্ক্ষা, তখন তারই খুশির টানে তোমাকে ফিরিয়ে নেব আমারই বিশ্রামে। প্রশ্ন করো না, সন্ধান করো না, পরিকল্পনা করো না। আমার ইচ্ছা প্রবাহিত হোক তোমার মধ্যে। যেমন শঙ্খের মধ্য দিয়ে বয়ে যায় সমুদ্র।”

“এইটুকু কেবল বুঝে নাও— কোনো পদক্ষেপ ব্যর্থ হবে না, একটি চেষ্টাও বিফলে যাবে না পরিণতিতে। কর্ম থেকে কম হোক স্বপ্ন। এখানে-ওখানে তুচ্ছ কারণে ঘুরবে ফিরবে তুমি, কিন্তু তোমার সকল যাতায়াত শেষ পর্যন্ত বিরাট পরিণতির সহায়ক হবে। তুমি অনেকের সাক্ষাৎ পাবে, কথাও বলবে তাদের সঙ্গে, কিন্তু জেনো, কেবল কয়েকজনই শুরু থেকে আমার,। তাদের সঙ্গে গোপন সংকেত বিনিময় করবে, আর তারা অনুসরণ করবে তোমাকে।”

“কী সে সংকেত?”

“যারা আমার— তাদের হৃদয়ে ঝলসায় কালীর বলিদানের খড়্গ। মাতার খড়্গ-অবতারের তারা আজন্ম উপাসক। তারা মৃত্যুপ্রেমিক— জীবনলুব্ধ নয়। তারা ভালোবাসে ঝড়-ঝঞ্ঝা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত। তারা আসবে তোমার কাছে না-জ্বলা মশাল নিয়ে আগুনের জন্য। উপচীয়মান পৃথিবীর উপর দিয়ে আমার কণ্ঠ ডাক দিয়ে ফিরছে জীবনের জন্য— নরপতিগণের প্রাণ ও রক্তের তৃষ্ণায় অধীর হয়ে। মনে রেখো, আমি চিৎকার করে ডাকছি, সেই ডাকে উত্তর কী করে দিতে হয় তাও দেখিয়ে দিয়েছি। এইটুকু জেনো, সর্বক্ষেত্রে মা-ই সর্বপ্রথম মৃত্যুতে ঝাঁপ দেন তাঁর সন্তানদের রক্ষার জন্য।”

“ধর্মকে যে নামই দেওয়া হোক, তা চিরদিনই মৃত্যুপ্রেম। তার মধ্যে আজ বিশেষভাবে সেইদিন এসেছে যখন আমার হাতে জ্বলছে ত্যাগের আগুন, যা মানুষকে বিচারবুদ্ধি থেকে ছিঁড়ে এনে দগ্ধ করবে দারুণ বাসনায়। আমার চিহ্নিত মানুষেরা এখন ঝাঁপ দেবে ত্যাগে, যেমন অন্য মানুষেরা ছুটছে ভোগে। শ্রম, সেবা, পীড়ন, যন্ত্রণাকে এখন মিষ্ট লাগবে— তিক্ত নয়। মহাকালের বুকে মহান এই নগ্ন— এখন, আমি মহাকালী, সেই আমিও জাতিসমূহের জননী।”

“সংকুচিত হয়ো না পরাজয়ে, আলিঙ্গন করো নৈরাশ্যকে। মুখের থেকে ভিন্ন নয় যন্ত্রণা— যখন উভয়কে চাই আমি। অশ্রুর জগতে এসে তাই আনন্দ করো, আর দেখো আমি হাসছি। মানুষের সঙ্গে ওখানেই আমার মিলনকুঞ্জ— এখানেই হৃদয়ের গভীরে আমি তাদের টেনে নিই।”

“আমার বিরোধী স্বার্থের শিকড় উপড়ে ফেলো। আমি যখন কথা বলব তখন প্রেম, বন্ধুত্ব, সুখ, আশ্রয়— কোনো কিছুর স্বর যেন শোনা না যায়। প্রাসাদ ছেড়ে এসে ভয়ানকের সমুদ্রে নিমজ্জিত হও। বিলাসের কক্ষ ছেড়ে এসে জ্বলন্ত নগরীর প্রহরী হও। এই জানো যে, একটির মতো অন্যটিও মায়া। নিয়তির সামনে দাঁড়াও সহাস্য মুখে।”

“নিজের জন্য করুণা চেয়ো না। তোমাকে আমি অপরের জন্য করুণাবারি বহনের আধার করে তুলব। সাহসের সঙ্গে মেনে নাও নিজের অনুকারকে, আর তোমার প্রদীপ উৎফুল্ল করুক বহুজনকে। নিম্নতম কাজ করো সানন্দে; উচ্চপদ ত্যাগ করো অনাকাঙ্ক্ষায়।”

“যে কঠোর কাজে তোমাকে নিয়োগ করেছি, খাড়া থাকো তাতে। বয়নের কাজ করো সযত্নে। তোমার কাছে দাবি করা হয়েছে— সে দাবির পূরণে পিছু হটো না। ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্বের কথা ভুলে যাও, পুরস্কারের প্রত্যাশা রেখো না। কঠিন নির্ভয় প্রতিজ্ঞায় স্থির— তুমি।”

“সূর্য যখন অস্ত যাবে, খেলা যখন সাঙ্গ হবে, তখন তুমি অবশ্যই জানবে, হে বৎস আমার— আমি কালী, আমি পুরুষকে দিই পৌরুষ, নারীকে দিই নারীত্ব, জয় আমার মুঠিতে— আমি তোমাদেরই মাতা।”

(তথ্য ঋণ : কালী দি মাদার, ভগিনী নিবেদিতা)

সংস্কার ভারতী রায়গঞ্জ শাখার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ২৫,২৬,২৭ আগস্ট উত্তরের সংস্কার ভারতী রায়গঞ্জ শাখার উদ্যোগে অঙ্কন, আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য, সমবেত নৃত্য ও কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ এবং এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় রায়গঞ্জ পৌরসভার বিধান মঞ্চে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বেতার ও দূরদর্শনের বিশিষ্ট লোকশিল্পী তারিণীমোহন বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দেবাশিস বিশ্বাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক বিকাশ কুমার ভৌমিক, কোষাধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ তালুকদার, সহ মাতৃশক্তি প্রমুখ শ্রীমতী শুক্লা অধিকারী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শাখার সভাপতি প্রণববন্ধু লাহিড়ী। পূর্বে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে শংসাপত্র সহ পুরস্কার প্রদান করেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত এবং রাজ্য সরকারের শিক্ষারত্ন স্থানীয় করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়, সারদা বিদ্যামন্দির (ইংরেজি বিভাগ)-এর প্রধানাচার্য ধ্রুবজ্যোতি অধিকারী এবং সংস্কার ভারতীর পদাধিকারীগণ। অনুষ্ঠানে সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন বিকাশ কুমার ভৌমিক। সঞ্চালনা করেন শ্রীমতী শুক্তা অধিকারী ও শ্রীমতী সুতপা মিশ্র।

মেদিনীপুরে পিআইবি-র কর্মশালা 'বার্তালাপ'

কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে সাংবোদিক ও সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে গত ৩০ আগষ্ট মেদিনীপুর শহরে প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরো কলকাতার উদ্যোগে মিডিয়া কর্মশিবির 'বার্তালাপ'-এর আয়োজন করা হয়। পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলা থেকে শিবিরে ৭০ জনের বেশি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। কর্মশিবিরে পিআইবি কলকাতার অতিরিক্ত মহানির্দেশক শ্রীমতী জেন নামচু বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ মানুষের কল্যাণে যে সমস্ত উদ্যোগ গ্রাহণ করেছে সে সম্পর্কে গণমাধ্যমের সাহায্যে তাঁদের সচেতন করে তুলতেই এই কর্মশিবিরের আয়োজন। তিনি সাধারণ মানুষের কল্যাণে কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পের প্রভাব ও সুফল সম্পর্কিত খবর আরও বেশি করে প্রকাশের জন্য সাংবাদিকদের আহ্বান জানান। মেদিনীপুরের প্রবীণ সাংবাদিক কুমারেশ ঘোষ কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগসুবিধা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে পিআইবি-র দেওয়া তথ্য বেশি করে ব্যবহারের দন্য সাংবাদিকদের পরামর্শ দেন। সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশন (সিবিএফসি)-এর প্রাক্তন আঞ্চলিক নির্দেশক দিব্যেন্দু দাস সাধারণ মানুষের কল্যাণে সাংবাদিকদের কাজ কাজ করে যাওয়াক আহ্বান জানান। জেলার অগ্রণী ইউবিআই-এর আধিকারিক দ্বিভুজেন্দ্র সরকার এবং জেলা নাবার্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার নিরঞ্জন ভুঁইয়া স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য বিভিন্ন ঋণ সহায়তা প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন। জেলা নেহরু যুব কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীমতী সাথী রায় যুবকেন্দ্রের পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেন। পিআইবি-র সংবাদ প্রচার সংক্রান্ত কাজকর্মের বিবরণী অডিও-ভিস্যুয়াল পদ্ধতিতে সকলের সামনে তুলে ধরেন কার্যালয়ের বরিষ্ঠ কর্মী শান্তনু সিংহ।

শিবিরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন পিআইবি কলকাতার যুগ্ম নির্দেশক অজয় মেহমিয়া। কর্মশিবির পরিচালনা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পিআইবি কলকাতার উপ-নির্দেশক শ্রীমতী চিত্রা গুপ্ত।

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসে শিখ গুরুপরম্পরা পুণ্য পবিত্র ও চিরস্মরণীয়

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

সুলতানি আমলের শেষে পঞ্চনদীর দেশে ভারতবর্ষের জীবনযাপন স্বর্গের স্পর্শ পেয়েছিল। অধুনা পশ্চিম পঞ্জাবের এক ব্যবসায়ী কালুচন্দ্রের ঘরে মাতা ত্রিপতাদেবীর কোল আলো করে জন্মেছিলেন গুরু নানক দেব। তালবন্দি বা নানকানার সেই সন্তান ৫৫০ বছর ধরে বিশ্বকে আলোকিত করছেন। পিতা পুঁজি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন— কিন্তু নানক তরুণ বয়সেই তহবিলদারি করতে পারেননি। কিছুদিনের মধ্যেই আতুর-আর্থী-প্রার্থীদের জন্য সব তহবিল খরচ হয়ে যায়।

মাত্র সাতাশ বছর বয়সে নানক বেরিয়ে পড়েন, গৃহত্যাগ করে উদাসীন সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। পূর্বে কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ, জগন্নাথ তীর্থ থেকে পশ্চিমে মক্কা মদিনা পর্যটন করেন তিনি। গুরু নানকের শিষ্য সমাবেশ হলো। তারাই শিখ বলে বিবেচিত হলেন। এক আশ্চর্য পথিক তিনি। ভাঙলেন বহু রীতিনীতি। একবার এক মন্দিরের পুরোহিত তাঁকে দেব দর্শনে বাধা দিয়ে বলেন, তোমার মধ্যে নির্দিষ্ট সন্ন্যাসবর্গের চিহ্ন নেই। বাইরে বেরিয়ে গুরু নানক

গাইলেন, অন্ধকার ঝিঁঝিডাকা রাত্রে আকাশের তারারা তখন তাঁর দিকে দীপ্তি ছড়াচ্ছিল! তাঁর গানে ছিল প্রীতি প্রসন্ন প্রবীণ বেদনার সারাৎসার : হে বিরাট, তুমি তো আছো সর্বত্র। পুরোহিতরা তোমাকে মন্দিরের মূর্তিতে বন্দি করেছে। আমি তো তোমার সাড়া পাচ্ছি, তারার দীপ্তিতে— ঝিল্লির ঝংকারে। তুমি তো সর্বত্র বিদ্যমান।

এই গানটি রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় ছিল। তিনি গুরু নানক সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর 'কাজের লোক কে', 'বীরগুরু', 'শিখ স্বাধীনতা' ইত্যাদি প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিচার উত্থাপিত হয়েছে। তিনি মনে করতেন 'গুরু নানক' থেকে 'গুরু গোবিন্দ সিংহ' পর্যন্ত শিখ জাতির উত্থান ও বিবর্তন ভারত ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যারা একটি প্রদেশে বিকশিত হলেও ভারতবর্ষের ঐক্যমূলক জীবন-বোধ সঞ্চারিত হয়েছিল শিখ ধর্মান্দোলনে। এজন্য তাঁর মতে পাঠান মোগল শাসনের তুলনায় শিখ-ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্তর্গত। পাঠান ও মোগল শাসন ঐক্যমূলক নয়— সেখানে প্রতাপের অহংকার, বিজিতের রক্তপাত, নারীর উপর বলাৎকার আর অধর্ম। তাঁর ভাষায় : 'গোড়ায় ধর্মের ইতিহাস রূপে শিখ ইতিহাসের আরম্ভ হইয়াছিল। বাবা নানক যে স্বাধীনতা অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নহে।' ('শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ', রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ; ১৯৬১; ১৩শ খণ্ড; পশ্চিমবঙ্গ সরকার; ৪৪৩ পৃ.)

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ধর্ম-স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে ধর্মরক্ষার স্বাধীনতা বিষয়ে শিখধর্মের শেষ গুরু, দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের কার্যকলাপ সম্পর্কে খুব উচ্চধারণা পোষণ করেননি। এখানে রবীন্দ্র-মনের একটি কোমল দিক হয়তো প্রকাশিত। তবে তিনি গুরু গোবিন্দ সিংহকে একজন নিপুণ সেনাপতি

হিসাবে দেখেছেন। তাঁর ভাষায় গুরু গোবিন্দ 'শিখদের তরবারি দান করিলেন।' (ওই; ৪৪৪ পৃ.) এর ফল ভালো হয়নি বলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতবর্ষে কিন্তু অধর্ম বিনাশের জন্য ধর্মযুদ্ধ চিরকাল স্বীকৃত হয়ে আসছে। শিখ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে রবীন্দ্রভাবনা আমাদের কাছে আংশিক মনে হয়।

শ্রীঅরবিন্দ 'মিথ্যার পূজা' নামক উদ্দীপক প্রবন্ধে লিখেছেন : 'মোগল সম্রাট যখন একদিন...মদগর্বে অন্ধ হইয়া শিখগুরুকে ধর্মত্যাগ করিতে বলিয়াছিল, তখন শিখ গুরু হাসিতে হাসিতে আপনার মাথা দিয়াছিলেন; ধর্ম দেন নাই।' (পশ্য : Sri Aurobindo : writings in Bengali & Sanskrit, the Complete works of Sri Aurobindo, Sri Aurobindo Ashram Trust, 2017; Pondichery; ১০১ পৃ.)। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ধর্মকে জাতিধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন— শ্রীঅরবিন্দ যুগধর্ম-জাতিধর্মকে সনাতন ধর্ম বিকাশের পূর্ব শর্ত বলে মনে করেছেন।

॥ ২ ॥

গুরু নানক একবার পশ্চিম দিকে পা রেখে শুয়েছিলেন। এক মৌলবি তাঁকে এসে তিরস্কার করেন। কারণ পশ্চিমদিক হলো কাবা তথা আল্লাহের স্থান। নানক তৎক্ষণাৎ তাকে প্রশ্ন করেন, ঈশ্বর কোথায় নেই? আপনি দয়া করে বলে দিন সেই দিকে পা রাখব না। মূঢ় মৌলবি এর উত্তর দিতে স্বভাবতই ব্যর্থ হন। কিছু আগে লিখেছি, রক্ষণশীল পুরোহিতের কথা। বস্তুত নানকের ধর্ম উপলব্ধির দিকে দৃষ্টি ফেলেছেন। ভক্তি আন্দোলনের এই বৈশিষ্ট্য। মুসলমান শাসনকালে ধর্ম যখন আক্রমণাত্মক অমানবিক হয়েছিল নানকপন্থা তখন উদাসীন, শাস্ত্রকারের বাইরে নিত্য মানবের কথা বলেছে।

নানক ক্ষত্রিয় বংশীয়। তাঁর পিতার পদবি ছিল বেদী। কোনো কোনো সূত্রে তাঁর জন্মস্থানের নাম রায়পুরা। অক্ষয়কুমার দত্ত রায়পুরা আর অলওয়াঙ্গি একই স্থান বলে মনে করেন। বর্তমানে তালিওয়ান্দি পশ্চিম পাকিস্তানে।

নানকের মধ্যে প্রথম দিকে কয়েকটি প্রবণতা দেখা যায়। তিনি হিন্দু মুসলমানের নিত্য বিরোধ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তাঁর বহু উপদেশে এই পরস্পর দ্বন্দ্ববিধুর সম্প্রদায়ের সমালোচনা আর সাধারণ মনুষ্যত্ব বোধের জয়গান লক্ষ্য করা যায়। তাঁর উপদেশ মধ্যযুগের সন্তদের মতোই সহজ ভাষায় দোহার আকারে বলা। তিনি নিরাকার অলখ নিরঞ্জনের উপাসক ছিলেন। একটি চমৎকার দোহায় আছে—

ঘরমে ঠাকুর নজর না আওয়ে
গলমে পাহন্ লে লট্ কাওয়ে।।
ভরমে ভুলা শাক্য ফিরতা।
নীর বিলোড়ে খর খর করতা।।
জিস পাহন কো ঠাকুর করতা।
সো পাহন লে তুমকো ডুবতা।

ভাবার্থ : তোমার দেহ মন্দিরে দৃষ্টি না ফেলে তুমি গলায় ঝুলিয়ে রাখছ পাথর। ভ্রমবশত তুমি শবকে দেবত্ব দান করছ, জলে পড়ার পর সবই খরস্রোতে সশব্দে ভেসে যায়। যে পাথর দিয়ে গড়া নৌকা তোমার— ভাবছ পারাপারে সাহায্য করবে; তুমি ভুল ভাবছ— ওই পাথরের নৌকা তোমাকে ডুবিয়ে ছাড়বে।

শুদ্ধ ভক্তি, পরম নির্ভরতা নানকদেবের ধর্মভাবনার মূল কথা। তিনি একদিন পরমেশ্বরের কাছে আকুল হয়ে প্রার্থনা করেন— আমি তোমাকে চিনতে পারি না কেন? আকাশবাণী হয়, তুমি চোখ বোজো। চোখ বুজতে তিনি অনুভব করেন একটি গভীর গম্ভীর শব্দ হচ্ছে। প্রণব ধ্বনিবৎ সেই শব্দ তাঁকে ঈশ্বর উপলব্ধির দিকে উন্মুখ করে। শব্দটি হলো 'ওঁয়া'। ঠিক যেন প্রণব ওঙ্কারের গুরুমুখী রূপ। শব্দটি প্রসারিত হলো— নানক অনুভব করলেন তিনি যেন শুনছেন 'ওয়াগুরু'। এসবই ভক্তদের কথা। গুরু নানকের এক ভক্ত ছিলেন কলবৃন্ত— তিনি এই কথা প্রচার করেন। কলবৃন্তের নাম ভেদ কলসন্ধু। যাই হোক, গুরু নানক বললেন, আমার আয়ু যদি কোটি কোটি বৎসর হয়— যদি আমি চাঁদ আর সূর্যের মতো এক জোড়া চোখ পাই— তা হলেও তোমার ব্যাখ্যান, রূপের বর্ণনা দিতে পারবো না। পরম নির্গুণ তাঁকে বললেন, আমিই জগতের প্রকৃত সত্তা— গুরু। তুমি আমার শিষ্য— শিখ। তুমি আমার প্রতিনিধি— জগতের গুরু।

১৫২৬ নাগাদ বাবর ভারতে তুর্কি শাসনের অবসান ঘটালেন— মোগল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। তিনি সমরখন্দ থেকে আসার পথে গুরু নানকের প্রভাব লক্ষ্য করে তাকে বন্দি করতে বলেন। শেষে জনশ্রুতি মতে বাবর গুরু নানকের সামনে নত মস্তক হয়েছিলেন— তাঁর উপলব্ধি : এই ফকিরের দিকে তাকালে আমার মনে হয়, ইনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতিনিধি। সত্য মিথ্যা যাই হোক, আফগানিস্তানের পূর্বে মোগল ভারতের পশ্চিমে শিখ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব মুসলমান যুগে ভারত ইতিহাসের গৌরবজনক ইতিবৃত্ত সন্দেহ নেই।

গুরু তাঁর শিষ্যদের সংসার বিরাগী উদাসীন হতে, যোগীদের মতো আত্মনিগ্রহ করতে নিষেধ করেন। সংযত জীবন যাপন— হিন্দু মুসলমানে ভেদ দূর করার জন্য নিরামিষ-ভোজনের পরামর্শ দেন। তিনি শিখদের সৎপথে ব্যবসা বাণিজ্য করতে বলেছিলেন। কর্মঠ শিখ সমাজের আত্মোন্নয়নে এই উপদেশের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। তবে গুরু নানকের আদর্শ ধর্মমত বাস্তবের কঠিন আঘাতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। ভারত ইতিহাসে এই পর্ব অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। সে ইতিহাস পুনর্গঠিত হওয়া দরকার। এ এক আশ্চর্য ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই লিখেছেন— যে ধর্ম ছিল, সর্ব মানবের চিরন্তন আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার প্রকাশ, তা হয়ে উঠল ভারতের স্বধর্ম রক্ষার আত্মত্যাগী বীর সৈনিকদের স্বাধীন বিত্ততার নিদর্শন। 'পঞ্চ নদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে' এই যে জনপ্লাবন তার অন্য নাম ধর্মযুদ্ধ। কেমন করে শিখ ধর্ম ভারতীয় জীবন-পদ্ধতির অগ্রবাহিনী হয়ে উঠল তা আসলে আমাদের স্বর্ণিল ইতিহাসের অঙ্গ।

॥ ৩ ॥

প্রথমেই লিখি প্রায় ২১২ বছর পঞ্জাবের ইতিহাস মোগল-বাদশাহদের পাশাপাশি গৌরবজনক ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকেছে। ১৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে গুরু নানকের সন্ন্যাস গ্রহণ থেকে ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দে দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের প্রয়াণ, একদিক থেকে মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসের সমান্তরালে চলেছে। এই ইতিহাস আমরা ঠিক মতো স্মরণ করি না। তাই আমরা সাহেবদের ইতিহাস মুখস্থ করি; বামপন্থী আরবি অর্থপুষ্ট

ইতিহাসের পিটুলি গোলাকে দুধের বিকল্প ভাবি।

বিষয়টি বোঝাতে প্রথমেই শিখ গুরু পরম্পরার কথা লেখা দরকার।

১. আদি গুরু : গুরু নানক (১৫.৪.১৪৬৯—২২.৯.১৫৩৯)

২. গুরু অঙ্গদ (৩১.৩.১৫০৪—২৯.৩.১৫৫২) (গুরু পদে বৃত হন ৭.৯.১৫৩৯)

৩. গুরু অমর দাস (৫.৫.১৪৭৯—১.৯.১৫৭৫) (গুরু পদে বৃত হন ২৬.৩.১৫৫২)

৪. গুরু রাম দাস (২৪.৯.১৫৮৪—১.৯.১৫৮১) (গুরু পদে বৃত হন ১.৯.১৫৭৪)

৫. গুরু অর্জুনদেব (১৫.৪.১৫৬৩—৩০.৫.১৬০৬) (গুরু পদে বৃত হন ১.৯.১৫৮১)

৬. গুরু হরগোবিন্দ (১৯.৬.১৫৯৫—২৮.২.১৬৪৪) (গুরু পদে বৃত হন ২৫.৫.১৬০৬)

৭. গুরু হররায় (১৬.১.১৬৩০—৬.১০.১৬৬১) (গুরু পদে বৃত হন ৩.৩.১৬৪৪)

৮. গুরু হরকিশন (৭.৭.১৬৫৬—৩০.৫.১৬৬৪) (গুরু পদে বৃত হন ৬.১০.১৬৬১)

৯. গুরু তেগ বাহাদুর (১.৪.১৬২১—১১.১১.১৬৭৫) (গুরু পদে বৃত হন ২০.৩.১৬৬৫)

১০. গুরু গোবিন্দ সিংহ (২২.১২.১৬৬৬—৭.১০.১৭০৮) (গুরু পদে বৃত হন ১১.১১.১৬৭৫)

এঁদের জীবন ও কর্মের সামান্য পরিচয় দেওয়া যাক। গুরু অঙ্গদদেবের বাল্য নাম ছিল লেহনা। তিনি হরিকে গ্রাম থেকে আসেন। জন্ম হয় 'মুক্তাসরসাহিব'-গুরুদ্বারে। দেহাবসান হয় অমৃতসরে। বসারকে গ্রামের বৈষ্ণব পরিবারের অমরদাস শিখ ধর্ম গ্রহণ করেন সত্তর বছর উত্তীর্ণ হবার পর। গুরু রামদাস লাহোরের হরিদাস ও দয়া কাউরের সন্তান। তিনি অমৃতসরের বিখ্যাত অমৃত-সরোবর নির্মাণ করিয়েছেন। গুরু অর্জুন গোইন্দবাল সহিব গুরুদ্বারের প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানা যায়। গুরু অর্জন জাহাঙ্গিরের কোপ দৃষ্টিতে পড়েন। তাঁকে লাহোরে বন্দি করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তিনি জাহাঙ্গিরের পুত্র খসরু (পরবর্তীতে শাহজাহান)-কে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্ররোচিত করেছেন— এই কাল্পনিক অভিযোগে জাহাঙ্গীর গুরু অর্জুনকে জরিমানা করেন। গুরু অর্জুন জরিমানা দিতে অস্বীকার করেন। তাঁর মৃত্যু শিখ জাতিকে প্রতিহিংসার আগুনে প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞায় নব জীবন দিয়েছিল। এই রোমাঞ্চকর ইতিহাস ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগের গৌরবজনক অধ্যায় রচনা করেছে।

মাত্র এগার বছর বয়সে গুরু অর্জুনের জ্যেষ্ঠপুত্র হরগোবিন্দ গুরু অর্জুনের আত্মবলিদানের পর গুরুপদে বৃত হন। গুরু হবার পরই কর্তারপুরের যুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বে শিখ বাহিনী পৈন্ডে খানকে পরাস্ত করেন। ১৬৩৪ সালে অমৃতসরের যুদ্ধে গুরু হরগোবিন্দ মোগল সেনাপতি মুখিস খানকে পরাস্ত করেন। একই বছর লাহোরের যুদ্ধে মাত্র চার হাজার দুর্ধর্ষ শিখ সৈন্য শাহজাহানের নেতৃত্ব চৌত্রিশ হাজার মোগল সৈন্যকে পঞ্জাব-ছাড়া করেছিলেন। এসব উৎসাহ উদ্দীপনার ইতিহাসের গৌরব থেকে বিগত সত্তর বছরের কংগ্রেস-পোষিত বামপন্থী ঐতিহাসিকরা ভারতবাসীকে বঞ্চিত করেছেন। আজ সময় এসেছে এই গৌরবগাথা পুনরায় জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করা।

চণ্ডু শাহ ছিলেন জাহাঙ্গিরের প্রিয় পাত্র। তাঁকে বধ করা আর কাশ্মীর দখল করা গুরু হরগোবিন্দের বীরত্বের পরিচয় বহন করছে। জাহাঙ্গীর এতে রুষ্ট হয়ে তাঁকে বন্দি করে নিয়ে যান গোয়ালিয়র দুর্গে। বিশাল সংখ্যায় শিখরা তখন গোয়ালিয়র দুর্গ অবরোধ করেন। গুরু হরগোবিন্দের এই বিপুল জন সমর্থন জাহাঙ্গিরকে ভীত করেছিল। তিনি গুরু হরগোবিন্দকে মুক্তি দেন।

গুরু অর্জুন শিখদের সততার সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য অর্থোপার্জন করতে বলেছিলেন। হরগোবিন্দ তাদের সামরিক জাতিতে পরিণত করলেন। তিনি নিজে ৮০০ অশ্ব ৩০০ অশ্বারোহী ৩০ জন বন্দুকধারী সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণ করতেন।

গুরু হরগোবিন্দ শতদ্রু তীরে প্রাণত্যাগ করলে তাঁর পৌত্র হররায় সামান্য কিছুদিনের জন্য গুরুপদে বৃত থাকেন। তিনি শাহজাহানের পুত্র দারাশিকোর বন্ধু ছিলেন। উত্তরাধিকারের প্রশ্নে জ্যেষ্ঠপুত্র দারাকে সমর্থন করেন গুরু হররায়। আওরংজেব একথা কখনো ভোলেননি। ফল গুরু নানকের সর্বধর্ম সমন্বয় ও শ্রদ্ধাবোধ থেকে শিখ জাতি তীব্র ইসলাম বিশেষত মোগল-বিরোধী হতে বাধ্য হয়। ততদিনে তারা জেনেছেন মুসলমানরা কোনোভাবেই অন্য ধর্মমতের সঙ্গে সমন্বয় সাধনে আগ্রহী নন। হররাইয়ের মৃত্যুর পর গুরু হরকিশন অকালে বসন্ত রোগে মারা যান।

হরকিশনের পর গুরু হলেন হরগোবিন্দের পুত্র তেগ বাহাদুর। গুরু তেগ বাহাদুর প্রথম দিকে মোগলদের সঙ্গে সহযোগিতা করে গেছেন। জয়পুরের রাজাদের সঙ্গে অসম অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন গুরু তেগবাহাদুর। সেই অভিযানে আপন হাফিজ নামক লুঠেরা বহু ধনসম্পদ লুঠ করেছিল। আওরংজেবের কাছে সংবাদ যায় এই কাজে তাকে সাহায্য করেছেন গুরু তেগ বাহাদুর। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে নিষ্ঠুর আওরংজেব তাঁকে ডেকে এনে 'চাঁদনিচকে' (দিল্লির) প্রকাশ্যে শিরশ্ছেদ করেন। ইসলাম কবুল করলে তাঁকে ছেড়ে দেবার শর্ত ছিল। বীর তেগবাহাদুর তা স্বীকার করেননি। ইতিহাস বলছে লুঠতরাজের অভিযোগ ছিল মিথ্যা। আসল কারণ ছিল গুরু তেগবাহাদুর কাশ্মীরের পণ্ডিত ও অন্যান্য হিন্দুদের উপর অত্যাচার, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের বিরোধিতা করেছিলেন।

গুরু তেগবাহাদুর 'আনন্দপুর সাহিব' গুরুদ্বার গঠন করেছিলেন। সেখানে থাকতেন তাঁর পুত্র গুরু গোবিন্দ সিংহ। নিষ্ঠুর বর্বর আওরংজেব গুরু তেগবাহাদুরের ছিন্নমুণ্ড আনন্দপুর সাহিবে পাঠিয়ে দেন। তখনও গুরু গোবিন্দ গুরুপদে বৃত হননি! তার বয়স ৯ বছর। সহনশক্তির শেষ প্রান্তে পৌঁছে শিখ-বিদ্রোহ সমাজ সংগঠনের অনিবার্যতার ক্রান্তিলগ্নে গুরু গোবিন্দ সিংহ ইতিহাসের যুগপুরুষ হয়ে দেখা দিলেন।

॥ ৪ ॥

গুরু গোবিন্দ সিংহকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বীরগুরু'। একেবারে যথাযথ বিশেষণ। তাঁর আত্মোৎসর্গী পিতা গুরু তেগবাহাদুরকে বলা হতো 'হিন্দ্ কী চাদর'। হিন্দুদের রক্ষাকর্তা। প্রকৃতপক্ষে গুরু হরগোবিন্দের সময় থেকেই শিখরা ভারতবর্ষের রক্ষাকর্তার ভূমিকা

নিয়েছেন। পশ্চিম-উত্তর সীমানায় তাঁদের প্রহরা আজও চলমান।

অসম অভিযানের সময় গুরু তেগবাহাদুরের স্ত্রী গুজরীদেবী ১৭ পৌষ (অন্যমতে ১৮) শনিবার মধ্যরাতে ১৭৭৩ বিক্রম সংবতে— ডিসেম্বর ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে পাটনাতে গুরু গোবিন্দের জন্ম দেন।

গুরুপদে বৃত হবার পর অসমের রাজা রতন সিংহ গুরু গোবিন্দ সিংহকে একটি হাতি উপহার দেন। হাতিটির নাম ছিল 'প্রসাদী'। এটি গুরুর খুব প্রিয় ছিল। কেহলুর রাজা ভীম চাঁদ গুরুর কাছে হাতিটি চেয়েছিলেন। গুরু গোবিন্দ তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত করেন। নাহানের রাজা দুজনের সন্ধি করেন। ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে কার্তিক মাসে 'পাওনতা'-গ্রাম পত্তন করেন গুরু। আওরংজেবকে তখন আফগানরা অপছন্দ করছে। সইয়দ বুদ্ধু শাহের মাধ্যমে আফগান সর্দারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন গুরু গোবিন্দ। কয়েকজন আফগান সর্দার তাঁর পক্ষে চলে আসেন। এদের মধ্যে ফালে খান, হায়াত খান আর ভিখেন খান প্রধান।

১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে ৩০ মার্চ তারিখে গুরু গোবিন্দ সিংহ গড়ে তোলেন 'খালসা'। খালসা-প্রতিষ্ঠা গুরু গোবিন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী ঘটনা। সংগঠন-নীতি প্রতিষ্ঠা-সংযম আর সেবার উদ্দেশ্যে গড়া খালসা শব্দটি আরবি থেকে এলেও মূল অর্থ থেকে সরে গেছে। আরবি অর্থ ছিল 'মুক্ত'। গুরু গোবিন্দ একে 'বিশুদ্ধ' অর্থে প্রয়োগ করেছেন। খালসা-পন্থের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। যথা :

১. কৃতিনাশ : খালসার অন্তর্গত কেউ ছোটো বা বড়ো নয়। সবাই সমান।

২. কুলনাশ : বর্ণভেদ দূর করা খালসা পন্থের উদ্দেশ্য।

৩. ধর্মনাশ : চতুর্বর্ণকে একত্র করে ধর্ম-সংস্কার অস্বীকার।

৪. কর্মনাশ : আচার অনুষ্ঠানের সর্বস্বতা অস্বীকার।

এছাড়া তিনি তুর্কিদের সংহার করা খালসাদের আসল লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করেন। খালসা-পন্থকে কেউ কেউ গুরু গোবিন্দের রাজস্ব বলে শনাক্ত করেছেন।

একটি পাত্রে জল রেখে বাতাসা দিয়ে গুরু তাঁর খড়্গ দ্বারা ঘুলিয়ে পাঁচজন শিখকে পান করিয়ে দিয়ে বলেন আজ থেকে তোমাদের জাতি-বর্ণ নেই, তোমরা সবাই খালসা। এই পাঁচজনের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয়, তিনজন শূদ্র ছিলেন। সবাইকে তিনি সিংহ পদবি দান করলেন। শিখ মাত্রই পুরুষ সিংহ— গুরু গোবিন্দ সিংহের এই উদ্দীপনা তুলনাহীন। গুরু বললেন কীর্তি রক্ষা করলে বিশ্ববিজয়ী হবে তাঁর খালসা বাহিনী।

খালসাদের জন্য কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেন গুরু গোবিন্দ সিংহ। যেমন :

১. কামাসক্ত হয়ে সধর্মীর মাতা বা ভগিনীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাবে না।

২. বিধিবদ্ধভাবে কন্যা সম্প্রদান না করা অন্যায়।

৩. কন্যা মা ভগিনীর ধন অপহরণ করা যাবে না।

৪. দুঃখীর ধন অপহরণ করা, তার উপর অত্যাচার করা যাবে না।

৫. শিখ কখনো মুসলমান বা তুর্ককে নমস্কার জানাবে না।

৬. অন্য কোনো শিখের নিন্দা, মিথ্যা অপবাদ করা যাবে না।

৭. অঙ্গীকার করলে তা পালন করতেই হবে।

৮. পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি, পতিতাপল্লীতে গমন নিষিদ্ধ।

৯. জুয়াখেলা শিখের পক্ষে নিষিদ্ধ।

১০. নাম, দান আর স্নান শিখের কর্তব্য।

এইভাবে কঠোর ভাবে সংযত বিশুদ্ধ খালসা প্রতিষ্ঠা গুরু গোবিন্দ সিংহের স্থায়ী অবদান। নারী জাতির প্রতি সম্মান ও অধিকার প্রদান শিখপন্থের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়— তা বিধি নিষেধগুলি দেখলেই বোঝা যাবে।

গুরু গোবিন্দ বলেন, তাঁর পর থেকে নতুন কেউ গুরু হবেন না। গুরু হবেন 'গ্রন্থসাহিব'। পাঁচজন শিখ একত্রিত হয়ে জলাভিষিক্ত বা 'পাহল' অনুষ্ঠান পালন করার প্রথা তাঁর কীর্তি। অভিষেকের সময় অন্য উৎসাহব্যঞ্জক সময়ে উচ্চারণ করতে হবে 'ওয়া গুরুজী কা খালসা! ওয়া গুরুজী কি ফতে।' জড় ধাতু পদার্থের মধ্যে ইস্পাত গুরুগোবিন্দের মতে শ্রদ্ধেয়। এজন্য সব শিখ ইস্পাতের অস্ত্র রক্ষা করবে। নীল বস্ত্র ধারণ, পাঁচটি প্রতীক— কেশ, কঙ্কন, কঙ্ঘা (চিরুনি), কৃপাণ ও কচ্ছ (অন্তর্বাস)— এই পঞ্চ 'ক'-এর ব্যবহার প্রতিটি শিখের জন্য অপরিহার্য।

॥ ৫ ॥

বীরত্ব স্বাধীনতা স্বাভিমান রক্ষা ছাড়া ভারতীয় জনজীবনে শিখ পন্থের ভূমিকা বৌদ্ধিক ক্ষেত্রেও কম নয়। গুরুনানকের বাণী ছাড়াও ভারতের নানা ভক্তিপথের কাব্যাংশ সংগ্রহ করে সংকলিত 'গুরুগ্রন্থ সাহিব'-কে আদি গ্রন্থ বলে ধরা হয়। শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুন দেব এটি সংকলন করেন। আদি গ্রন্থ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা : জপ, সোদর রয়রস, কীরিৎসোহিলা, গীত, ভোগ। নানক, অঙ্গদ, অমরদাস, রামদাস, অর্জুন আর তেগ বাহাদুরের রচনা এখানে সংকলিত। এছাড়া কবীর, রয়দাস, নামদেব, ধন্না, জয়দেব, রামানন্দ, সুরদাস, মীরা বাঈয়ের বহু সংগীত গ্রন্থসাহেবে আছে। আছে মুসলমান পির শেখ ফরিদের রচনাও।

আরও বহু রচনা গুরুমুখী ভাষায় নানা সময়ে সংকলিত হয়েছে। 'ভোগকা বাণী', 'শ্লোকময়হলে পহলা', 'হকীকত', 'রতনমালা', 'দশমপাদশাহ কী গ্রন্থ' মধ্যযুগের পাঞ্জাবী-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। 'দশমপদশাহ কী গ্রন্থ' গুরু গোবিন্দ সিংহের রচনাবলী। এখানে হিন্দু পুরাণ, অবতারবাদ, দেব দেবীর কথা আছে। বিশেষ করে দুই খণ্ডে 'চণ্ডীচরিতর', 'চণ্ডী কি বার', 'জ্ঞান প্রবোধ', 'চৌত্রিশ অবতারা', 'ব্রহ্ম অবতার', 'রুদ্র অবতার' উল্লেখযোগ্য। তাঁর সামাজিক দৃষ্টি ধরা পড়ে 'ইস্ত্রি চরিতর', ঐতিহাসিক বিবরণ 'হাকায়ত', ভক্তিভাব 'অকাল ইসতাল' বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তাঁর জীবন নাট্য 'রচিতর নাটক'।

তিনি পণ করেছিলেন অত্যাচারী পিতৃহন্তা আওরংজেবকে হত্যা ছাড়া থামবেন না। শেষ যুদ্ধ যাত্রা পথে তিনি জানতে পারেন আওরংজেবের মৃত্যু হয়েছে। ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণাত্য পথে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে গুরু গোবিন্দ সিংহের প্রয়াণ হয়। মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসে নানক থেকে গুরু গোবিন্দ স্বর্ণশিখরময় অমৃতসরোবরের মতো পুণ্য পবিত্র চিরস্মরণীয়।

(গুরু নানকদের ৫৫০ বর্ষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য

রবি রঞ্জন সেন

১৩ এপ্রিল ১৯১৩ সালে পঞ্জাবের নববর্ষ ও গুরুগোবিন্দ সিংহ দ্বারা খালসা পন্থ প্রতিষ্ঠার দিন। সেইদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় অমৃতসরের বিশ্ববিখ্যাত শিখ ধর্মস্থান স্বর্ণমন্দির বা হরিমন্দির সাহিবের ঠিক পাশেই অবস্থিত জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক উদ্যানে ব্রিটিশের গুলিতে নিহত হন প্রায় ১৫০০ নিরস্ত্র নির্দোষ ভারতীয়। এই ভয়ংকর ঘটনাই আমাদের রক্তরঞ্জিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 'জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড' নামে প্রসিদ্ধ।

ঘটনার বেশ কয়েকবছর আগে থেকেই পঞ্জাব এবং অখণ্ড বাঙ্গলার বিপ্লবীরা ব্রিটিশ শাসকের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। ১৯১৫ সালে রাসবিহারী বসু, বাঘাযতীন প্রমুখ এবং পঞ্জাবের গদর পার্টির নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে বিদ্রোহ ঘটানোর যে প্রচেষ্টা হয়েছিল, যা ইতিহাসে 'ইন্দো জার্মান ষড়যন্ত্র' বলে খ্যাত। এই সমস্ত বিপ্লবী কার্যকলাপ কড়া হাতে দমন করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার ১৯১৮ সালে এক প্রাক্তন বিচারপতি সিড্‌নি রাওলাট-এর নেতৃত্বে 'সিডিশন' বা রাজদ্রোহ কমিটি গঠন করে। ১৮ মার্চ ১৯১৯ এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী 'Anarchical and Revolutionary Crime Act' বা সাধারণ ভাষায় রাওলটি অ্যাক্ট আইন হিসাবে প্রবর্তিত হয়। এই আইন অনুযায়ী স্থানীয় প্রশাসন যে কোনো ভারতীয়কে ইচ্ছামতো পরোয়ানা ছাড়াই তল্লাশি বা গ্রেপ্তার করতে পারত এবং কেবলমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে বিচার ছাড়াই এক বছর পর্যন্ত বন্দি রাখতে পারত। স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয়রা এই আইনকে সাধারণের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করে এবং এর বিরুদ্ধে চারিদিকে প্রতিবাদ শুরু হয়।

দেশের বিভিন্ন শহরে সত্যাগ্রহ সভা হয় এবং সাধারণ ধর্মঘট বা হরতালের ডাক দেওয়া হয় প্রথমে ৩০ মার্চ পরে পিছিয়ে ৬ এপ্রিল। কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে সত্যাগ্রহের ডাক দেওয়ার আগেই পঞ্জাবে জোরালো প্রতিবাদ শুরু হয়।

এই সময়ে পঞ্জাবে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের তীব্র জনরোষের অনেকগুলি কারণ ছিল-- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য নির্মমভাবে সৈন্য নিয়োগ ও সরকারের আর্থিক দাবিদাওয়া আদায়, খাদ্যশস্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রের ফলে স্বদেশি 'পিপল্‌স্ ব্যাঙ্ক অব পঞ্জাব' ধ্বংস ইত্যাদি। গদর পার্টির বিপ্লবের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর ব্রিটিশ ধরপাকড় আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে রাওলাট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে লেখা প্রকাশিত হয় ও লাহোর, অমৃতসর, লুধিয়ানা, শিয়ালকোট, রাওয়ালপিণ্ডি প্রভৃতি শহরগুলিতে প্রতিবাদ সভা আয়োজিত হয়। এর ফলে সারা প্রদেশে প্রতিবাদের পরিবেশ নির্মিত হয়-- হরতালের দিন দোকানপাট বন্ধ থাকে ও মানুষ কালো ব্যাজ ধারণ করে। পঞ্জাবের এই প্রতিবাদের নেতৃত্বে ছিলেন ডাঃ সত্যপাল, ডাঃ সাইফউদ্দিন কিচ্‌লু, রামভজ দত্ত চৌধুরী, শার্দূল সিংহ কৌশীর প্রমুখ। ৯ এপ্রিল ছিল রামনবমী। হান্টর কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী ওই দিনের শোভাযাত্রায় চোখে পড়ার মতো মুসলমান অংশগ্রহণ করে। সেই দিনই সন্ধ্যায় ডাঃ সত্যপাল এবং কিচ্‌লুকে গ্রেপ্তার করে ধর্মশালা শহরে প্রেরণ করা হয়।

নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১০ এপ্রিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে শহরের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় ও মানুষ রাস্তায় নামে। পুলিশ শান্তিপূর্ণ মিছিলের পথ

আটকায় যার ফলে পাথর ছোঁড়া শুরু হয়। পুলিশ গুলি চালায় যার ফলে দশজন মারা যায় ও অনেকে আহত হয়। উন্মত্ত জনতা এর ফলে সরকারি সম্পত্তি অফিস, ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, রেল স্টেশন ইত্যাদি ব্রিটিশ শাসনের প্রতীক মনে করে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। আক্রোশের শিকার হয়ে কয়েকজন ইউরোপীয় নিহত হয় ও এক ইংরেজ মহিলা সিটি মিশনারি স্কুলের ম্যানেজার মিস্ শারউড আক্রান্ত হন।

স্থানীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের ফলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে সরকারের হাতের বাইরে বেরিয়ে যায় এবং শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ পরিণত হয় গণ অভ্যুত্থানে। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের মতো পরিস্থিতি আসন্ন ভেবে পঞ্জাবের লেফটেনান্ট গভর্নর স্যার মাইকেল ও'ডায়ার আতঙ্কিত হন। ১১ এপ্রিল তিনি সামরিক আইন ঘোষণা করেন এবং বিদ্রোহ দমনের জন্য জেনারাল রেজিনাল্ড ডায়ারকে অমৃতসর প্রেরণ করেন। জেনারাল ডায়ার বাহিনী নিয়ে সারা শহর দাপিয়ে বেড়িয়ে সমস্ত সভা ও জমায়েত নিষিদ্ধ করেন। গণঅভ্যুত্থান দমন করার জন্য তিনি শহরের বাসিন্দাদের উপর নিপীড়ন শুরু করেন। যে 'কুচা কুচিয়ানওয়ালা' গলিতে মিস্ শারউড আক্রান্ত হয়েছিলেন সেখানে সমস্ত ভারতীয়দের হামাগুড়ির নির্দেশ দেওয়া হয়। এসম্বন্ধে পরবর্তীকালে হান্টর কমিশনের সামনে তাঁর বয়ানে তিনি বলেছিলেন, ''ভারতীয়রা তাঁদের দেবতার সামনে ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে। আমি তাদের বোঝাতে চেয়েছিলাম যে একজন ব্রিটিশ মহিলা হিন্দু দেবতার মতোই পবিত্র, তাই তার সামনেও তাদের হামাগুড়িই দিতে হবে!''

তবে সামরিক আইন এবং দমনপীড়ন তোয়াক্কা না করেই কয়েকজন স্থানীয় নেতা জালিয়ানওয়ালাবাগে প্রতিবাদ সভা ডাকেন। এই সভার দিনক্ষণ ঠিক হয় ১৩ এপ্রিল বিকেল সাড়ে চারটে। বৈশাখীর দিন।

প্রতিবছরের মতো বৈশাখী উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলায় কেনাকাটা করতে বহু মানুষ আশপাশের গ্রামগুলি থেকে অমৃতসরে আসে। সারা শহর জুড়ে আনন্দ-ফুর্তি ও উৎসবের পরিবেশ। সকাল থেকেই বহু মানুষ মহিলা শিশু-সহ হরিমন্দিরে গুরুস্থানে প্রণাম করে পার্শ্ববর্তী জালিয়ানওয়ালাবাগে এসে বিশ্রাম করে। এই উদ্যানটি মহারাজা রণজিৎ সিংহের আমলের অভিজাত জালিয়ানওয়ালা পরিবারের সম্পত্তি বলে এই নামে খ্যাত। উদ্যানটি উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত এবং একটি সরু গলি তার একমাত্র প্রবেশ বা প্রস্থান পথ ছিল। উদ্যানের একদিকে একটি কুয়া এবং অন্যদিকে একটি সুফি কবরখানা।

ইতিমধ্যে জেনেরাল ডায়ারও সকাল থেকে শহরের চতুর্দিকে সামরিক আইন ও কার্ফু জারি সংক্রান্ত নির্দেশ বলবৎ করার জন্য ঘুরছিলেন। তবুও জালিয়ানওয়ালা বাগে বিভিন্ন অনুমান অনুযায়ী দশ থেকে কুড়ি হাজার মানুষ সমবেত হয়। এই সমাবেশ বন্ধ করার জন্য তিনি সকাল থেকে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি, ফলে মানুষ নির্ভয়েই সমবেত হয় এবং নির্ধারিত সময়ে সভাও শুরু হয়। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় গোর্খা ও বালুচবাহিনী-সহ তিনি উদ্যানে প্রবেশ করেন কিন্তু তখনও কোনোরকম বিপদের আশঙ্কা না করেই সভার কাজ চলতে থাকে। ডায়ার যখন কোনোরকম সতর্কবাণী ছাড়াই গুলি করার নির্দেশ দেন। তখনও প্রথম কয়েক মুহূর্ত জনগণ মনে করে বোধহয় 'ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার' করা হচ্ছে। পরমুহূর্তেই চারপাশে গুলিবিদ্ধদের পড়ে যেতে দেখে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়নের চেষ্টা করে। কিন্তু একমাত্র বাহির পথ সেনাবাহিনী দ্বারা রুদ্ধ এবং চারপাশে প্রাচীর। অনেকে কুয়ার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণরক্ষার চেষ্টা করে কিন্তু সেভাবেও বাঁচা সম্ভব ছিল না।

দশ মিনিট অবিরাম ১৬৫০ রাউন্ড গুলি চালনার পর যখন অবশেষে গুলির জোগান শেষ হয় তখন বাহিনী-সহ তিনি সেখান থেকে চলে যান। আহত ও নিহতরা একসঙ্গে স্তূপীকৃত হয়ে সারারাত সেই খোলা উদ্যানে পড়ে থাকে। সরকারি পক্ষ থেকে কোনো চিকিৎসার বন্দোবস্ত হয়নি, আহতদের পানীয় জলও দেওয়া হয়নি। অমৃতসরের এক শিখ মহিলা নিহত স্বামীর খোঁজে সেখানে এসে স্বামীর নিথর দেহ আগলে কীভাবে সারারাত সেই আহত-নিহতদের মাঝে কাটিয়েছিলেন সেই মর্মান্তিক বিবরণ বর্তমানে জালিয়ানওয়ালাবাগ প্রদর্শনীস্থলে রক্ষিত আছে।

এই ভয়ংকর দশ মিনিটের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৩৭৯ নিহত ও ১২০০ আহত। বেসরকারি অনুমান অনুযায়ী প্রকৃত সংখ্যা তার তিনগুণ বেশি। কংগ্রেস তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী অন্তত ১,০০০ মৃত ও অন্যান্য স্থানীয় অনুমান অনুযায়ী প্রায় ১,৫০০ মৃত।

ঘটনার পর প্রথম কয়েক সপ্তাহ ব্রিটিশ সরকার জেনারাল ডায়ারের কাজের সমর্থন করে এবং সামরিক আইন বলবৎ রাখে অর্থাৎ নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা চলতে থাকে। ঘটনার পরের দিন অর্থাৎ ১৪ এপ্রিল গুজরানওয়ালাতে ক্ষিপ্ত জনগণকে দমন করার জন্য তাদের উপর আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ হয়। কিন্তু ঘটনার বীভৎসতার খবর যখন পঞ্জাবের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে এবং নিন্দা ও প্রতিবাদে সারাদেশ মুখর হয় তখন সরকার বাধ্য হয় ঘটনার তদন্তের জন্য হান্টার কমিশন গঠন করতে। এই কমিশন জেনেরাল ডায়ারকে দোষী সাব্যস্ত করে। কারণ তিনি কোনোরকম সতর্কবাণী ছাড়াই নিরপরাধ ও নিরস্ত্র মহিলা, পুরুষ ও শিশুদের নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কমিশনের সামনে ডায়ার বলেন যে তিনি এভাবে গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন বিদ্রোহী ভারতীয়দের মধ্যে 'নৈতিক প্রভাব' তৈরি করার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ ত্রাস তৈরি করে ভারতীয়দের দমিয়ে রাখার জন্য। সরকার তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয় যদিও কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কিন্তু উগ্র ব্রিটিশ মহলে জেনারাল ডায়ারকে প্রশংসা ও সমর্থন করা হয়। হাউস অব লর্ডস তাঁকে সমর্থনের প্রস্তাব গ্রহণ করে ১২৬-৮৬ সংখ্যাগরিষ্ঠতায়। ব্রিটিশ সংবাদপত্র 'মর্নিং স্টার' তাঁর সমর্থনে তহবিল গঠন করে ২৬,০০০ পাউন্ড চাঁদা তোলে।

হান্টার কমিশনের সামনে ভারতীয় বন্দিদের সাক্ষ্য প্রদান করতে না দেওয়ায় কংগ্রেস এই কমিশনকে বয়কট করে ও নিজস্ব তদন্ত কমিটি গঠন করে। এই তদন্ত কমিটিতে মদনমোহন মালব্য, মোতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ, আব্বাস ত্যাবজী ও পরে গান্ধীজীও সদস্য ছিলেন। এই কমিশন দীর্ঘ পরিশ্রমের ফলে ঘটনার সঠিক তথ্যগুলি ভারতবাসী এবং আন্তর্জাতিক মহলে তুলে

ধরতে পারে।

গান্ধীজী হিংসার জন্য বেদনা প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু ব্রিটিশদের হত্যাকাণ্ডের চাইতে তিনি অধিক বিচলিত হয়েছিলেন জনগণের শান্তিভঙ্গে। সত্যাগ্রহের আহ্বানকে তিনি 'হিমালয় প্রমাণ ভুল 'বলে উল্লেখ করেন। ঘটনার পরের দিন অর্থাৎ ১৪ এপ্রিল ১৯১৯ বড়লাটের ব্যক্তিগত সচিব জে. এল. ম্যাফিকে লিখিত পত্রে তিনি বলেন, ''আমি ভুল শুধরে নিচ্ছি। আমার নিজের গ্রহণ করা পদক্ষেপ আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। যতদিন পর্যন্ত আমার সহকর্মীরা জনগণকে শান্ত ও সংযত রাখতে সক্ষম না হচ্ছে, ততদিন আমি দিল্লি ও পঞ্জাবে প্রবেশ করব না। ফলে বর্তমানে আমার সত্যাগ্রহ আমার নিজের দেশবাসীর বিরুদ্ধেই চালিত হবে।''

দুই মাস পর গান্ধীজী সত্যাগ্রহ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করেন। অনেকের অভিযোগ, তিনি এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদের চাইতে খিলাফৎ আন্দোলনকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই কংগ্রেস-এর বিরুদ্ধে কোনো বৃহত্তর দেশব্যাপী আন্দোলন করেনি।

ঘটনার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করেন। ৩০ মে বড়োলাটকে প্রেরিত পত্রে তিনি লেখেন, ''অদ্যকার দিনে আমাদের ব্যক্তিগত সম্মানের পদবিগুলো চতুর্দিকবর্তী জাতিগত অবমাননার অসামঞ্জস্যের মধ্যে নিজের লজ্জাকেই স্পষ্টতর করিয়া প্রকাশ করিতেছে, অন্তত আমি নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলতে পারি যে আমার যে সকল স্বদেশবাসী তাহাদের অকিঞ্চিৎকরতার লাঞ্ছনায় মানুষের অযোগ্য অসম্মান সহ্য করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়, নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মান চিহ্ন বর্জন করিয়া আমি তাহাদের পার্শ্বে নামিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি।''

জালিয়ানওয়ালাবাগে আহত এক উনিশ বছর বয়সের যুবক ঘটনার প্রতিশোধকেই তাঁর জীবনের লক্ষ্য বলে স্থির করেন। ১৯৪০ সালে অর্থাৎ ঘটনার একুশ বছর পর লন্ডনের ক্যাক্সটন হল্-এ ভূতপূর্ব লেফ্‌টেনান্ট গভর্নর মাইকেল ও'ডায়ারকে হত্যা করে সমগ্র ভারতীয় জাতির পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেন সরদার উধম সিংহ। ব্রিটিশ সরকার তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে ও কৃতজ্ঞ দেশবাসীর দ্বারা 'শহিদ' উপাধিভূষিত হয়ে উধম সিংহ ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ বলিদান করেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড স্বাধীনতা আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। কংগ্রেসের সূচনালগ্ন থেকে যে নরমপন্থী 'আবেদন-নিবেদন'-এর রাজনীতি বিদ্যমান ছিল সেই রাজনৈতিক ধারা অবলুপ্ত হয়ে যায়। পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশদের কল্যাণকারী উদ্দেশ্য সম্বন্ধ যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল তা চূর্ণ হয়ে যায়। হত্যাকাণ্ড এবং তার জন্য ব্রিটিশ জনমতের সমর্থন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ এবং ভারতীয় জনগণের স্বার্থ সম্পূর্ণ পৃথক দিশায় ধাবিত। এই ঘটনাকে ঘিরে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বহু দেশাত্মবোধক গান, নাটক, কবিতা প্রভৃতি রচিত হয় এবং এর প্রভাবে পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

স্বাধীন ভারতে দেশভক্ত মানুষের জন্য জালিয়ানওয়ালাবাগ একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। প্রাচীরের গায়ে গুলির দাগ দেখে এখনও আমাদের গায়ে কাঁটা দেয়। আর মনে মনে সেই দিনের সমস্ত শহিদ ও তাঁদের পরিবারবর্গকে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করি। এই বছর ১৩ এপ্রিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী হত্যাস্থানে উপস্থিত হয়ে সমস্ত দেশবাসীর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ভারতের বাইরেও বিভিন্ন দেশে প্রবাসী ভারতীয়রা হত্যাকাণ্ডের শতবর্ষ পালন করেছেন এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার দাবি বিভিন্ন মহল থেকে রাখা হয়েছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে এই দাবির যথার্থতা স্বীকার করলেও অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে অস্বীকার করেন।

ঘটনার শতবর্ষে দাঁড়িয়ে আমাদের স্মরণ করা দরকার কত আত্মত্যাগ ও রক্তপাতের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। ভারত আজ পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন দেশ, বিশ্বের পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতি, আজ আর কোনো শত্রু আমাদের চোখ রাঙাতে পারে না, কিন্তু রক্তের বিনিময়ে পাওয়া এই স্বাধীনতার মূল্য যদি আমরা না বুঝি তাহলে দাসত্বের সেই অন্ধকার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি অসম্ভব নয়।

তাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পুনর্বার সেই ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। ▌

স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা হয়ে উঠেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা

সারদা সরকার

ইউরোপের পায়ে পায়ে ইতিহাস। চলুন একটু ঘুরে আসি ইতিহাসের সঙ্গে পা মিলিয়ে ইংল্যান্ডের পথে পথে। আমরা খুঁজবো সেই ব্রিটেনের ভূমিসূতা নিবেদিতাকে, যিনি তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের জন্য সব দিয়েছিলেন।

আয়ার্ল্যান্ডের ডুঙ্গাননের সেই বাড়িটা আজ আর নেই যেখানে জন্মেছিলেন মার্গারেট নোবল। সেখানে রয়েছে একটি পাউন্ড শপ। কিন্তু এই বাড়িটা খুঁজে বের করতে লেগেছিল প্রায় একশো বছর। আয়ার্ল্যান্ডের অল্ডারম্যান মরিস হেয়েজ খুঁজে বের করেছিলেন। আজ তিনি নেই কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত পত্রে লিখেছেন, আমেরিকায় এক নিমন্ত্রণে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়, তিনি তখন প্রথম আলো লিখছেন। তার কাছে শোনেন নিবেদিতার কথা।

আয়ার্ল্যান্ডে ফিরে তন্ন তন্ন করে তাঁকে খুঁজে ফেরেন মরিস। আবিষ্কার হয় নিবেদিতার জন্মপত্র, সেই বাড়িটি চিহ্নিত করা হয়। আলস্টার হিস্ট্রি সার্কেলের প্ল্যাক বসে ২০১১ সালে নিবেদিতার মৃত্যু শতবর্ষে। পরে ডুঙ্গাননের মানুষ নিবেদিতাকে চেনে জিন ম্যাকগিনেসের হাত ধরে। আইরিশ জাতীয়তাবাদী এই মহিলা নিবেদিতাকে নিয়ে নাটক লেখেন, গ্রামের ছেলেমেয়েদের দিয়ে অভিনয় করান, মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে দেন আয়ার্ল্যান্ডের ভূমিসূতা নিবেদিতাকে। আজ ডুঙ্গাননের টাউনহলে নিবেদিতা রয়েছেন ওয়াল অব ফেমে। অপরাজিতা নিবেদিতার মূর্তি রয়েছে খুব যত্নে আদরে ভালোবাসায়। কাউন্টি টাইরোনের এই গ্রামটিতে প্রতি ২৮ অক্টোবর, নিবেদিতার জন্মদিনে বাসিন্দারা মেতে ওঠে উৎসবে। যোগ দেন রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্তরা, স্থানীয় বাঙ্গালি এবং ভারতীয় সমাজের মানুষও।

নিবেদিতা সেখানে জন্মেছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর বাবা কর্মসূত্রে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে ১৮৭৬ সালে ডেভনশায়ারে গ্রেট টরিংটনে থিতু হন। এই সময় তাদের পরিবারে মৃত্যু এসে ছুঁয়ে যায় তাঁর এক ভাই রিচার্ড নোবলকে। তাদের পরিবারের প্রথম সমাধিক্ষেত্র রচনা হয় গ্রেট টরিংটনে। পরে একে একে সকলেই এই সমাধিক্ষেত্রে শান্তির শয়ানে শায়িত থাকেন। নিবেদিতাও। আমরা সকলেই জানি দার্জিলিঙে নিবেদিতার সমাধির কথা, কিন্তু ডেভনশায়ারের এই সমাধিক্ষেত্রেও নিবেদিতা ঘুমিয়ে আছেন। স্যার জগদীশ চন্দ্র বোস নিবেদিতার চিতাভস্ম পাঠিয়েছিলেন। নিবেদিতার বোন মে এবং তার স্বামী আর্নেস্ট উইলসন সেই চিতাভস্ম এখানে গ্রহণ করেছিলেন। নিবেদিতার দেহাবশেষ সমাহিত হয়েছিল গ্রেট টরিংটনের সমাধিক্ষেত্রে। এই সিমেট্রির দেখভাল করেন ল্যুইজ আপ্টন নামে এক মহিলা। খুঁজে খুঁজে অনেক কষ্টে পৌঁছেছিলাম সেখানে একদিন। দেশের মানুষ অনেকেই জানেন না এই সমাধির কথা। স্বপ্ন দেখি একদিন এখানে হবে অনেক ভক্তসমাগম। টরিজ কাউন্সিলের আনুকূল্যে সিস্টার নিবেদিতার মূর্তি বসানোর অনুমতি মিলেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায় এখানে বসবে একটি ভগিনী নিবেদিতার ব্রোঞ্জ মূর্তি। টরিংটন সিমেট্রির ভুলে যাওয়া একাকিনী নিবেদিতা অব রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আবার জেগে উঠবেন আমজনতার মনের মণিকোঠায়। সেদিন আর দেরি নেই। আশাকরি সারা পৃথিবীর মানুষ এই মূর্তি দেখতে আসবেন গ্রেট টরিংটনে। ব্রিটেনে প্রথম পাবলিক প্লেসে নিবেদিতার এই সমাধিটি। কাছেই রয়েছে সেই চার্চ যেখানে নিবেদিতার পিতা কাজ করতেন। কিছু দরজা জানলা দেখলে মনে হয় সেগুলি হয়তো সেই সময়ের স্পর্শ বহন করে এখনও। নিবেদিতার শরীর এখানের মাটিতে মিশে আছে তাই এই মাটি এই হাওয়া বড়ো পবিত্র। এখন নিবেদিতার একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি বসেছে এই সমাধিস্থলে।

রামকৃষ্ণ মিশন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থসাহায্যে এই প্রথম ইংল্যান্ডে তথা ইউরোপে তথা ভারতবর্ষের বাইরে। এ এক অনন্য ইতিহাস রচনা হলো।

সিস্টারের বোন মে উইলসনের নাতি ক্রিস অর্পেনের সঙ্গে আলাপ হয়। ক্রিস অর্পেনের পরিবার অর্থাৎ নিবেদিতার বোনের পরিবার দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে গিয়েছিল নিবেদিতার দেহাবসানের পরে, যদিও ইংল্যান্ডের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবার আগে মে'র দুই কন্যা মার্গারেট ও গ্রান্সি দুজনকেই আশীর্বাদ করেছিলেন তাদের পিতৃসম আঙ্কল ড. জগদীশ চন্দ্র বোস। সেই গ্রান্সিকে লেখা সব চিঠির তোড়া আমাকে তুলে দিয়েছিলেন ক্রিস অর্পেন। মে এবং আর্নেস্ট উইলসনের কন্যা মার্গারেট এবং গ্রান্সির খুব কাছের মানুষ ছিলেন বসুদম্পতি। মার্গারেটের নামকরণ হয় মার্গারেট বোস উইলসন। নিবেদিতা এবং জগদীশচন্দ্রের নামে তাঁর নামকরণ হয়েছিল। সেই সব চিঠির তোড়ায় রয়েছে অমূল্য রত্ন— এক অনন্য নিবেদিতা যিনি শুধু বাৎসল্য রসে ভরপুর। মায়ের স্নেহে জড়িয়ে রেখেছেন প্রিয় বোন নিমের (মে উইলসন) কন্যাসন্তান দুজনকে।

ক্রিস অর্পেনের এখন ৮৭ বছর বয়স। তিনি নিবেদিতার সম্বন্ধে অনেককিছুই জানেন। তাঁর দিদিমা মে উইলসন ছিলেন খুব ঠায়ঠিকের মানুষ। দাদামশাই, নিবেদিতার ভগ্নীপতি, আর্নেস্ট উইলসন আচার্য জগদীশচন্দ্রকে গুরু মানতেন— ফিজিক্স গুরু। ইতালীয় বিজ্ঞানী মার্কনির ঘটনার পর খুব দুঃখ পেয়েছিলেন মে উইলসন এবং তাঁর স্বামী। ক্রিস অর্পেনের ভাষায় উইম্বলডনের বাড়িতে অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তির আনাগোনা ছিল রাসকিন স্কুলের সুবাদে। তিনি স্বামী বিবেকানন্দেরও অসম্ভব ভক্ত ছিলেন। হিন্দুধর্ম নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছেন মিস্টার আর্নেস্ট উলিসন। ভগিনী নিবেদিতার পরে ওই পরিবারে যদি কেউ হিন্দুধর্মে আগ্রহী হয়ে থাকেন তবে তিনি হলেন আর্নেস্ট উইলসন। নিবেদিতার মৃত্যুর পর সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসু অনেক চিঠিপত্র লিখেছিলেন সেগুলি এখন আমার সংগ্রহে রয়েছে, প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত হয়েছে। সেই সব পত্রের ছত্রে ছত্রে নিবেদিতার প্রতি বসুদম্পতির অনাবিল ভালোবাসার কথা লেখা রয়েছে। অবলা বসু লিখেছেন মে উইলসনকে একটু বেশি বেশি করে চিঠি লিখতে, মে চিঠি লিখলে নিবেদিতার শূন্যতা তবু কিছুটা ভরাট হয়।

> "বুদ্ধের যেমন সুজাতা, খ্রিস্টের যেমন মেরি ম্যাগডালেন তেমন বিবেকানন্দের মানসকন্যা হয়ে উঠলেন ভগিনী নিবেদিতা। এই নিবেদিতার জন্ম তো তাঁরই দেওয়া। জন্মদাতাকে পিতা ছাড়া আর কীভাবে ডাকা যায়? তিনি বয়সে মাত্র চার বছরের বড়ো কিন্তু তাতে কী? স্বামীজীর আকাশের মতো বিশাল জীবনে নিবেদিতা একটা ছোট্ট তারা বই তো কিছু নয়!"

মে উইলসনের নাতি ক্রিস অর্পেনের ছেলে গাই অর্পেন ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটির ডেপুটি ভাইস চ্যান্সেলর। কেমিস্ট্রির দিকপাল ছাত্র এই মানুষটি নিবেদিতার বংশধর, একটি অসামান্য চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন সিস্টার নিবেদিতাকে নিয়ে। এই লেখাটি লেখার সময় তিনি ইংল্যান্ডে এসেছেন এবং আমার মতো অকিঞ্চিৎকর মানুষকে সপরিবারে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন— এই সাক্ষাৎকারে আমার ভূমিকা শুধুই শ্রোতার। নিবেদিতার বোন মে উইলসন তাঁর দিদিমা হন। সেই মে কে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, ক্রিস অর্পেনের মা মার্গারেট বোস উইলসন, (জগদীশচন্দ্র বোসের নামে নামকরণ হয়েছিল যার) আঙ্কল বোসকে খুব ভালোবাসতেন।

গাই অর্পেনের লেখা চিঠিটি হুবহু তুলে দিলাম। উইম্বলডনের বাড়ির নীল ফলক বসবার সময় তাঁর এই চিঠিটি এসেছিল ইংলিশ হেরিটেজের কাছে।

Dear Ms Power

Many thanks for this kind invitation and for the blue plaque celebration that you and others, notably Sarada Sarkar, are planning for Sister Nivedita.

As Sarada Sarkar knows, Sister Nivedita (Margaret Noble) has been a very significant figure for her descendants, in my case the Orpen family, and the subject of interest and research for my father in his studies of our genealogy and heritage. He has shared with Sarada Sarkar some of his investigations and these have been reported recently in a publication.

I am afraid that I will not be able to attend the celebrations on 12 November due to other commitments for that weekend, but I am happy to pass on my best wishes, and that of my family (including my father and brother, neither of whom can attend either) to those attending and partcipating in the event.

Sister Nivedita was an exceptional woman and her lagacy is richly deserving of recording in this way–and I am very pleased that this distinguished member of our family is receiving this honor. I and my wider family are most grateful to you and all involved. I would be grate-

ful if you were to pass on these sentiments to those at the ceremony on 12th November.

With my best wishes

Guy Orpen

যাই হোক এই সিমেট্রিতে একই জায়গায় আছেন নিবেদিতার পিতা স্যামুয়েল, মা ইসাবেলা, ভাই রিচমন্ড, বোন মে আর নিবেদিতা নিজেও। জগদীশচন্দ্রকে সঙ্গে করে একদিন নিবেদিতা এসেছিলেন পিতার সমাধিতে। গ্র্যান্সির চিঠির তোড়ায় ছিল এমনই একটি চিঠি। মে উইলসনকে আদর করে নিম বলে ডাকতেন নিবেদিতা।

C/o. Mrs. Allen

South 81, Torrington

1908, Good Friday Night

My sweet Nim,

We went to Papa's grave this evening and planted wild primroses and violets there. Mrs. Bull and Dr. Bose and I. It was Dr. Bose's plan and he thought of the violets and found the sod of roots for the place.

The sun set so wonderfully behind the pine trees. But that was behind his head. The part of a grave you know is towards the dawn and the east.

Papa is not there, dear. But the place was so sacred to me still, for I felt that it was the spot of our great sorrow and our brothers' farewell to home for such long weary years. But I have tried hard not to feel that our Loved one has any special tie to that sweet spot. Death is really the ceasing to be able to think of the prisoning body. It lets one go free into utterly new conditions, I feel sure. And the pain we had in our loneliness was after into utterly new conditions, I feel sure. And the pain we had in our loneliness was after all a thing to make light of. It is over now. And we would not remember it. So the sweet, serene spirit is to be given peace and freedom from our old sorrow–is he not ? And the grave is only as a shelf on which was once laid a folded vesture. It is all a dream– life as well as death. And they who see life in the hands of this death, to them belong eternal peace. Hurts none else. Hurts none 'else'. your own, Peggy.

আমার মিষ্টি নিম,

আজকে বাবার সমাধিতে আমরা গিয়েছিলাম, কিছু বুনো প্রিমরোজ আর ভায়োলেট ফুলের গাছ পুঁতে এসেছি। আমি, মিসেস বুল আর ডক্টর বোস তিনজনে মিলে গেছিলাম। ভায়োলেট ফুলের কথাটা অবশ্য ডক্টর বোসই বলেছিলেন, আর নিজে থেকেই গোড়াসমেত ফুলগাছ নিয়েও এসেছিলেন। পাইন গাছের পিছন দিয়ে সূর্যাস্ত হচ্ছিল, অপূর্ব লাগছিল দেখতে কিন্তু ওটা সমাধির পিছন দিকটা। তুমি তো শুধু পুবদিকে ভোরের আলো যেখানটায় পড়ে, সেই দিকটাই চেনো, সেটা সামনের দিকটা।

নিম এখন বাবা আর নেই, কিন্তু এখনও এই স্থান আমাদের কাছে পবিত্র। এখানে এলেই আমরা সেই তখনকার দিনগুলোকে অনুভব করতে পারি। ছোটো ভাই রিচার্ডকে বিদায় দেবার বেদনাময় দিনগুলো মনে পড়ে যায়। কিন্তু আমি চেষ্টা করি প্রিয়জনের স্মৃতির সঙ্গে এই জায়গাটাকে একসূত্রে না বাঁধতে। মৃত্যু তো শুধুমাত্র এই খাঁচাবন্দি দেহবোধটুকু ভুলে যাওয়ারই আরেক নাম। সম্পূর্ণ এক নতুন জগতে উত্তরণ হয় মৃত্যুতে। আমি জানি যে একাকিত্ববোধ আমাদের গ্রাস করেছিল, তা এখন অনেকটাই লঘু হয়ে গেছে। বাবার আত্মাকেও তো আমাদের এই মনখারাপের আগল থেকে মুক্তি দিতে হবে বল ? হবে না ? সমাধি তো শুধু একটা দেহের আধার মাত্র। জীবন মৃত্যু সবই স্বপ্নের মতো। যারা মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতার আলোয় জীবনটা দেখে তাদের কাছে চিরন্তন সত্যটা ধরা দেয়, আর কেউ তাহলে আঘাত পায় না, কেউ না।

তোমার একান্ত আপন পেগি।

১৮৭৭ সালে নিবেদিতার বাবা মারা গেছেন, তখন বালিকা নিবেদিতার বয়স মাত্র ১০ বছর। এরপর নিবেদিতা ১৮৮৪ সাল অবধি কাটান অর্ফ্যান স্কুলে। ক্রসলি হিথ স্কুল। পায়ে পা মিলিয়ে এবার আসি হ্যালিফ্যাক্স শহরে। পশ্চিম ইয়র্কশায়ারে ছবির মতো শহর। বিখ্যাত ব্যাঙ্ক হ্যালিফ্যাক্স এই শহরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখনও এখানেই তার শীর্ষ কার্যালয়। এহেন জায়গায় নিবেদিতার সেই স্কুল এখনও রয়েছে। এখন আর অর্ফ্যান স্কুল নয় শিক্ষাজগতে মূলধারার স্কুল হিসেবেই সফল বিদ্যালয় রূপে। যেখানে নিবেদিতা আর তার বোন মে পড়তে এসেছিলেন। এই স্কুলের আর্কাইভেই তার বালিকাবেলার ছবিটি পাওয়া গিয়েছিল। মি. চেস্টার এখানকার ডেপুটি হেডটিচার, আমার সঙ্গে যোগাযোগ হয় মাঝেমধ্যেই। বলেছিলেন ছাত্র-ছাত্রীদের একদিন সিস্টার নিবেদিতা নিয়ে স্কুল অ্যাসেম্বলিতে বলতে। ওদের ওয়েবসইটে নিবেদিতা নিয়ে একটি পাতা রাখা হবে তাতে আমাকে কিছু সাহায্য করে দিতেও অনুরোধ করেছেন তিনি। লিজেল রেম্যাঁর জীবনীর অনলাইন কপি রেখে দেওয়া হবে যাতে ওঁর স্কুলের ছেলে-মেয়েরা নিবেদিতার কথা জানতে পারে, উৎসাহিত হয়। স্কুলটিতে নিমন্ত্রণ করেছেন আর্কাইভের সমস্ত নথিপত্র আমাদের দেখাবেন বলে। দুই শিশু কীভাবে সদ্যপিতৃবিয়োগের পরে হঠাৎ করে বড়ো হয়ে গিয়েছিলেন তার গল্প যদি কিছু জানা যায় বিদ্যালয়ের সংগ্রহ থেকে।

ইসাবেলা মার্গেসনের বাড়িতে ১৮৯৫ সালে যে ইতিহাসের রচনা হয়েছিল তাতে সেদিনের সেই মার্গারেট নোবল পরে হয়ে উঠেছিলেন ভারতবর্ষের নিবেদিতা। স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে সেদিন ভৌগোলিক সীমানা তুচ্ছ করে সাড়া দিয়েছিলেন বহু মানুষ। ব্রিটিশ রাজধানীতে তুফান ? টেমসের জল আভূমি প্রণাম করে ছুঁয়েছে তাঁর পা ! সাইক্লোনিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ এসেছেন লন্ডনে। টেমস শহর এর আগে অনেক নামি অনামি ভারতীয়কে দেখেছে। অভুক্ত, পরাধীন, হীনমন্যতার ভারতবর্ষ

থেকে এর আগে এমন স্বাভিমানী, যুক্তিবাদী, দার্শনিক, আত্মবিশ্বাসী এবং দারিদ্র্যবিক্রেতা নয় এমন মানুষ তাদের আগে বড়ো চোখে পড়েনি। অথবা তিনি কোনো ইন্ডিয়ান প্রিন্স বা রাজপুত্রও নয়, রানির দরবারে মণিমুক্তো, টাকাপয়সা ছড়াতেও আসেননি— গেরুয়া পরা ভিক্ষু তিনি, যেন ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং! শুধু সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন 'একটি বিন্দু জল'! এই দুর্গম যাত্রায় সঙ্গী কেবল বেদান্তের বাণী, সহনশীল, উদার, হিন্দুধর্মের সারমর্ম, 'যত মত তত পথ'! এমন অদ্ভুত কথা এদেশে কেউ আগে কখনো শোনেনি যে! তাই তো তাঁর ভাষণ শুনতে ভেঙে পড়ত তখনকার লন্ডনের শিক্ষিত সমাজ। এখানেই দেখা হয়েছিল ম্যাক্সমুলার, পলডসন মার্গারেট নোবল, লেডি ইসাবেলা মার্গেসন, সেভিয়ার দম্পতি, এছাড়া আরও অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। ক্যানন ইউলবারফোর্স বেদান্ত ভাষণে মুগ্ধ অভিভূত হয়ে অভিজাত ওয়েস্টমিনিস্টারে তাঁর বাড়িতে ডিনারে আমন্ত্রণ করেন স্বামীজীকে। আক্ষরিক অর্থে মিশনারি না হয়েও স্বামীজী বেদান্তবাণীতে মুগ্ধ করেছিলেন চার্চ অব ইংল্যান্ডের এই ধর্মযাজককে। সেসেমি ক্লাব, প্রিন্সেস হল, ওকলে স্ট্রিট, বেলুন সোসাইটি, ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট আজও লন্ডনের অভিজাত এবং জ্ঞানীগুণী সমাজেরই পরিচয় বহন করে। স্বামীজীর অসাধারণ বাগ্মিতা, জ্ঞান এবং দর্শন তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সাইক্লোনের সামনে খড়কুটোর মতো।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অতলান্তিক তরঙ্গের উপর দিয়ে হেঁটে এসে পথ দেখিয়েছিলেন একদিন— নিশ্চিন্ত নির্ভর ঠাকুর সব দায় অর্পণ করেছিলেন তাঁর নরেন্দ্রকে। ইচ্ছাসৃষ্ট বীর জাতীয়তাবাদী সন্ন্যাসী প্রতীচ্যে নিয়ে এসেছিলেন এক নতুন আধ্যাত্মিকতার দর্শন। তাঁর ক্ষত্রিয় সুলভ উগ্রতায় একদিকে যেমন ভেসে গেছে হিন্দুধর্মের জাতপাত সহ বহু অনাচার, অন্যদিকে তেমনই বেদান্ত বর্ণনায় টলে গিয়েছে ইল্যান্ডের শিক্ষিত সমাজ। কিন্তু নিবেদিতা প্রথম দর্শনেই নিশ্চিন্ত আত্মসমর্পণ করেননি। বরং এসেছিল কিছু প্রশ্ন, কিছু সংশয়। মার্গারেট যে তখন একটি ব্যক্তিগত আঘাতে জর্জরিত, একথা জানতেন প্রিয় বন্ধু অ্যাভেঞ্জার কুক। তাই বুঝি ইসাবেলা মার্গেসনের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে তিনিই এনেছিলেন তাকে। সেদিনের সেই বিদুষী তরুণী এসে পৌঁছেছিলেন সকলের শেষে। দশ পনেরো জন শ্রোতা ঘরের মধ্যে আলো আঁধারি, চড়া ধূপের গন্ধ সামনে ধ্যানমগ্ন স্বামী বিবেকানন্দ— বললেন শিব শিব ওম্ নমঃ শিবায়। অনেকক্ষণ ধরে বেদান্তের ব্যাখ্যা করলেন তিনি। চমৎকার ইংরেজি, শান্ত কণ্ঠের ওঠানামায় মাঝে মাঝে কিছু সংস্কৃত শ্লোকও বললেন স্বামীজী। স্বামীজী বললেন, অমানিশার রাত পেরিয়ে আঁধারের অবসান হোক। এই ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে আছে যে আলো, সেই আলো উদ্ভাসিত হোক। মায়ার জাল ছিন্ন করে আমরা যেন উত্তীর্ণ হতে পারি কালজয়ী, নাশহীন সত্যে। ওই সত্যই আমাদের আত্মা। বেদ বলছে সারা ভুবন জুড়ে চলছে পরিবর্তনের লীলা। সেই নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্যে অবিনশ্বর অবাঙ্মানসগোচর আত্মা একমাত্র পবিত্র পূর্ণাঙ্গ। Through it all shines our soul, independent, immortal, pure, perfect, holy. আমরা সকলেই অমৃতের সন্তান।

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়া-সম ছবি বিশ্ব-চরাচর।।
অস্ফুট মন আকাশে, জগৎ সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডুবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর।।
ধীরে ধীরে ছায়া-দল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি আমি'---এই ধারা অনুক্ষণ।।
সে ধারাও বদ্ধ হলো, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
'অবাঙ্মানসোগোচরম্', বোঝে—প্রাণ বোঝে যার।।

আত্মাই ঈশ্বর। মনে রেখো আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে পূর্ণাঙ্গ ঐশ্বরিকতা, প্রকাশ কর সেই দেবত্বকে। জাগ্রত কর আত্মাকে, মনে রেখো আমরা অপাপবিদ্ধ। যেমন রাতের আঁধারে জ্বলে তারার আলো তেমন আমাদের সকল দুঃখের মাঝে জ্বলছে তাঁর স্পর্শের আলো। ওঠো জাগো আর ঘুমিয়ে থেকো না। উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত!

মার্গারেটের সমস্ত শাণিত যুক্তি বুদ্ধি সেদিন পরাজিত হয়েছিল, এ তো শুধু কথার কথা নয় স্বামী বিবেকানন্দের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ যেন উঠে এসেছিল গভীর গহন প্রত্যয় থেকে। কোনো সংশয় নেই, শুধু নিখাদ বিশ্বাস! সন্ন্যাসী যেন তার সামনে খুলে দিলেন সুদূর প্রসারিত নতুন সত্যের

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন

আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর

3 in 1 Account

(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
Find us on Facebook
E-mail : drsinvestment@gmail.com

আলো। এই আত্মোপলব্ধি সন্ধান দিল নতুন এক সরণির। যে ব্যক্তিগত বেদনায় তিনি হতাশায় ডুবে ছিলেন তা যেন এক মুহূর্তে সরে গেল। সব দ্বিধা বেদনা হতাশার ওপারে এক উজ্জ্বল আলো! তিনিই মার্গারেট নোবেলের গুরু, পথপ্রদর্শক। কিন্তু এই বিশ্বাস এমনিতে আসেনি, সহজেও আসেনি। বিবেকানন্দও কিন্তু গুরু রামকৃষ্ণকে যাচাই করে নিয়েছিলেন। একবার নয় বহুবার, ঠাকুর যেমন নরেন্দ্রনাথের সামনে ফুটে উঠেছিলেন অবতার বরিষ্ঠ রূপে, ঠিক তেমনই নিবেদিতাও নানা প্রশ্নে বিদ্ধ করেছেন স্বামীজীকে বহুবার। অন্ধের মতো অনুসরণ করার মেয়ে তিনি নন। লেডি মার্গেসনের বাড়ির পর লন্ডন শহরে আরও দুটি জায়গায় মার্গারেট ছুটে গিয়েছিলেন স্বামীজীর বক্তব্য শুনতে। বেদান্ত কেন মহৎ, কেন উদার, হিন্দু সন্ন্যাসীর যুক্তিকে পাল্টা যুক্তির খেলায় ভাঙতে চান এই আগুনের পাখিটি। স্বামীজী যেন জানতেন এই মেয়েই পরবর্তীকালের রামকৃষ্ণ আন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে উঠবে। তাই সস্নেহে আরও আরও যাচাই করার সুযোগ দেন মার্গারেটকে। 'কিন্তু' এবং 'কেন' এই দুটি শব্দে স্বামীজীকে ঘিরে ফেলতেন, তাঁর বক্তব্যকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলে দেওয়াই যেন মার্গারেটের উদ্দেশ্য। আসলে স্বামীজী জানতেন এসব কিছুই আসলে পরম সত্যকে জানার ব্যাকুলতা। তাই তো বুঝি বলেছিলেন সস্নেহে, 'আমার ছ' বছর লেগেছিল রামকৃষ্ণকে গ্রহণ করতে'।

স্বামীজী যখন দ্বিতীয়বার এলেন লন্ডনে, তখন চারমাস অতিক্রান্ত। মার্গারেট ভালো করে সেই সব নোটস পড়েছেন, হিন্দুধর্ম নিয়ে কিছু মৌলিকত্ব তাঁর কাছে এখন অনেক পরিষ্কার। লন্ডনে পিকাডিলির প্রিন্স হলে একটি সভায় স্বামীজী বললেন, 'তোমাদের কলকব্জা, ছাপাখানায় যা না হয়েছে, তার চেয়ে খ্রিস্ট বা বুদ্ধের কয়েকটি কথায় মানবসমাজের ঢের বেশি উপকার হয়নি কী? পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে নিদারুণ অর্থলোভ, অনুদারতা আর নিষ্ঠুর যুদ্ধবার্তা। শান্তিপ্রিয় হিন্দু কি আর তা দেবে বলে তোমরা আশা করো?' তিনি বলেছিলেন, 'আমি কোনো গুপ্তবিদ্যা সমিতির পক্ষ থেকে তন্ত্রমন্ত্রের ম্যাজিক দেখাতে আসিনি, বিশ্বাসও করি না। সত্য স্বপ্রকাশ, সবাই তাকে যাচাই করে নিতে পারে'। এই বিবেকানন্দ মার্গারেটকে মুগ্ধ করেছে। তিনি এক উদার ধর্ম আন্দোলনের কথা বলেন, মানবতাকে সবার ঊর্ধ্বে স্থান দেন, দেশ ও জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসাকে ধর্মাচরণের উপরে রাখেন। নিজেকে নিছক সাধন ভজন আচার বিচারে বেঁধে না রেখে জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করতে বলেন। তিনি সন্ন্যাসী না বিপ্লবী?

স্বামীজী কিন্তু এই উদার ধর্মবোধ পেয়েছিলেন তাঁর গুরু পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। যত মত তত পথ, এমনকী কালী সাধনার সঙ্গে ইসলাম সাধনায়ও সিদ্ধি লাভ করে দেখিয়ে দিয়েছেন জলকে যে নামেই ডাক না কেন জলের ধর্ম একই থাকে। সেই যুগে সেই সময়ে এই অভিনব সাধনা তো বিপ্লবই বটে। বলেছেন নাটকে লোকশিক্ষে হয়, নটি বিনোদিনী-সহ সম্পূর্ণ নাট্যজগতের নারীদের সামাজিক স্বীকৃতি মিলতো না, ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রথম তাঁদের মর্যাদা দিয়েছেন। গুরুর এই উদার ধর্মপরিচয়কে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী পা রেখেছিলেন পশ্চিমে। তাঁর দরিদ্র, মূর্খ, চণ্ডাল ভারতবাসীর প্রতি ভালোবাসা মার্গারেটকে ধীরে ধীরে টেনে আনছিল ভারতের দিকে।

পরে প্রিয়সখী জোসেফিনকে লিখেছেন, 'স্বামীজী যদি না আসতেন আমার জীবনে, যদি হিমালয় শিখরে ধ্যানে ডুবে থাকতেন? তবে আমি তো এখানে আসতে পারতাম না! আমার জীবনটা একটা অসম্পূর্ণ স্বপ্নের মতো রয়ে যেত'।

বুদ্ধের যেমন সুজাতা, খ্রিস্টের যেমন মেরি ম্যাগডালেন তেমন বিবেকানন্দের মানসকন্যা হয়ে উঠলেন ভগিনী নিবেদিতা। এই নিবেদিতার জন্ম তো তাঁরই দেওয়া। জন্মদাতাকে পিতা ছাড়া আর কীভাবে ডাকা যায়? তিনি বয়সে মাত্র চার বছরের বড়ো কিন্তু তাতে কী? স্বামীজীর আকাশের মতো বিশাল জীবনে নিবেদিতা একটা ছোট্ট তারা বই তো কিছু নয়!

লন্ডনের জীবন, উইম্বলডনের স্কুল, নাম যশ বিষয় বৈভব তার আর কোনো কাজে লাগবে না। মার্গারেট এখন নিবেদিতা। তার দেশ হবে এখন থেকে ভারতবর্ষ। বাগবাজারের গলি, গঙ্গার গেরুয়া রঙ, সারদা মায়ের অপাপবিদ্ধ পবিত্র ভালোবাসা আর সন্ন্যাসী রাজার স্নেহ এই তার সম্বল। ভারতবর্ষের মুক্তিকামনা এখন একমাত্র নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। স্বামীজীর দেওয়া কাজে জীবন ডুবিয়ে দেওয়া একমাত্র লক্ষ্য। প্রকৃত অর্থে নিবেদিতা হয়ে উঠার।

(লেখিকা লন্ডন প্রবাসিনী নিবেদিতা গবেষিকা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name	:	**OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No.	:	**917020084983100**
IFSC Code	:	**UTIB0000005**
Bank Name	:	**AXIS Bank Ltd.**
Branch	:	**Shakespeare Sarani, Kolkata**

পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু বাঙ্গালির স্বাভাবিক বাসভূমি

সঞ্জয় সোম

সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদ বললেই প্রশ্ন উঠবে কোন সংস্কৃতি আর কোথাকার সংস্কৃতি? সংস্কৃতির এই দুটি dimension-কে পৃথক করা যায় কিনা, যেমন পাড়ার পুজো থেকে পাড়া এবং পুজোকে আলাদা করা যায় কিনা, কেউ ভেবে দেখবেন? বিশ্ব জুড়ে ৪৯টি মুখ্য সভ্যতার মধ্যে একমাত্র এই হিন্দু সভ্যতাই আজও সগর্বে বেঁচে আছে। কেন, কীভাবে বাঁচলো? কাশীর মহিমা কী, পুষ্করের চরিত্র কী, কাঞ্চীপুরমের ঐতিহ্য কী, কেন তারা আজও সচল? এই ঐতিহাসিক চিরকুমারত্বের অন্তর্নিহিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা কী? যদি বলেন inclusion আর Assimilation-এর জন্য হিন্দুসভ্যতা চিরনবীন, তাহলে একদিকে হিমালয় আর তিনদিকে ইন্দু মহাসাগর দিয়ে ঘেরা এই ভৌগোলিক হিন্দুভূমির ত্রিসীমানার সংস্কৃতি বিদেশিদের আগমন বা আক্রমণের আগে কেমন ছিল? আচ্ছা, হিন্দুরাষ্ট্রের ভূগোল কী চিরকাল এক ছিল, নাকি রাজনৈতিক সীমারেখার সঙ্গে রাষ্ট্রসংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক নেই? যদি composite culture-এর গল্প ফাঁদেন, অর্থাৎ গঙ্গা-যমুনা তেহেজিব জাতীয় কিছু তাহলে ৬৮ খ্রিস্টাব্দে যখন আমাদের পূর্বপুরুষ ইহুদিদের আপন করে নিয়েছিলেন, চতুর্থ শতাব্দীতে যখন ক্যানানাইটদের আশ্রয় দিয়েছিলেন আর ৮ম শতাব্দীতে পারসিকদের, তখন যে বসুধৈব কুটুম্বকমের সংস্কৃতি তাঁদের গ্রামৈব কুটুম্বকমের মানসিক সংকীর্ণতা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, সেটা তবে কাদের সংস্কৃতি?

পঞ্চম শতাব্দীতে কবি ভর্তৃহরি যখন লিখছেন, 'মাতা মেদিনী, তাত মারুত, সখে তেজ, সুবন্ধু জল, ভ্রাতৃব্যোম' ইত্যাদি, তখন কোন সংস্কৃতি তাঁকে পঞ্চভূতকে আত্মীয়জ্ঞানে সম্বোধন করতে উদ্বুদ্ধ করছে? আচ্ছা, বিশ্বমানবতার উৎস কোথায়? মানুষ তো কোন ছাড়, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত সুখে থাক, নীরোগ থাক, কেউ যেন দুঃখী না হয়, সকল প্রাণীজগৎ যেন শান্তিতে থাকে— এই প্রার্থনা কোন সংস্কৃতির দান? ফাদার ইউসেবিয়াসের লেখনী মোতাবেক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০-র আশেপাশে যখন সুদূর এথেন্সে গিয়ে একজন হিন্দু সক্রেটিসকে পার্থিব

জীবন আর আধ্যাত্মিক জীবনের পার্থক্য বোঝাচ্ছেন, তখন assimilation হচ্ছে না dissemination হচ্ছে, একটু বোঝান তো মশাই? অভেদবুদ্ধি না ভেদবুদ্ধি, অধিকার rights-centric হবে না dutycentric, প্রতিবাদী না প্রতিপক্ষ, সংবাদ না বিবাদ, অর্থ না পরমার্থ ইত্যাদি নানাবিধ বিচার, বিতর্ক এবং বিশ্লেষণ কি শুধুই স্থান-কাল-পাত্র নির্ভর, সংস্কৃতি নির্ভর নয়? মাঝে মাঝেই পাশ্চাত্য প্রবন্ধে পড়ি, Rome collapsed; আমি মনে করি Rome went out of ideas and the idea of Rome then got exhausted. আবার তাহলে সেই মূল প্রশ্নে ফিরতে হয়। প্রতিটি সভ্যতার মূলে তার সংস্কৃতি, যা দীর্ঘদিনের চর্চার মাধ্যমে পরিশীলিত হতে হতে সমাজে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য উত্তরাধিকার হিসেবে আত্মস্থাপিত হয়। তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জুড়ে থাকে জীবনদর্শন, যাকে আমরা এই হিন্দুভূমিতে ধর্ম বলি। How come we never went out of ideas? এবার শেষ তিনটি প্রশ্ন, প্রাসঙ্গিক আর সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদের সঙ্গে হিন্দুত্বের (Hinduness) ঐতিহাসিক এবং ব্যবহারিক— দুটি সম্পর্কই সুদৃঢ় না থাকলে হিন্দুসংস্কৃতি তথা সভ্যতার স্থায়িত্ব ও ক্রমবিকাশ কীভাবে সম্ভব? ভারতবর্ষে হিন্দুত্ব সুরক্ষিত না থাকলে পৃথিবীতে বহুত্ববাদ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের অস্তিত্ব থাকবে কি?

এতসব কথা এই কারণে উঠছে যে, দুর্ভাগ্যবশত আমাদের হিন্দুদের প্রাচীন মাতৃভূমি ভারতবর্ষ, এখনো যে দেশের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ হিন্দু, সেই দেশটি কিন্তু সাংবিধানিকরূপে ঘোষিত হিন্দুরাষ্ট্র নয়। কেন নয়, সেই প্রসঙ্গ অন্য। কিন্তু যেখানে ১৪.৫ কোটি ইহুদি পর্যন্ত নিজেদের জন্য একটি ইহুদিরাষ্ট্র গঠন করে ফেলতে পেরেছেন, আমরা ১০৫ কোটি হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষ নিজেদের বাপ-ঠাকুর্দার

ফঃ ৬

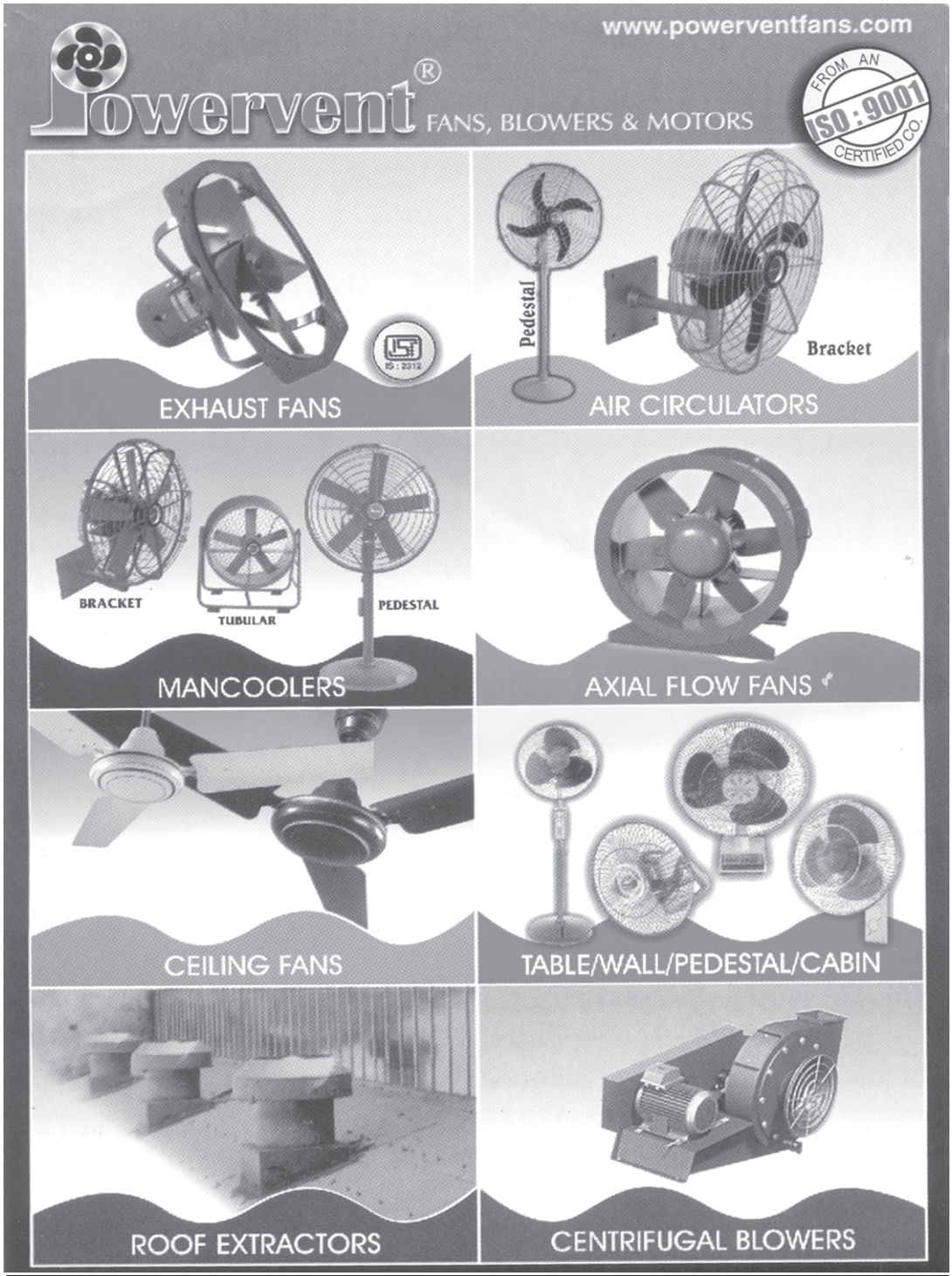

SHREE NURSING TIMBER & ELECTRIC STORES

PODDAR COURT

18, RABINDRA SARANI, GATE NO. 4, 2ND FLOOR, ROOM NO. 7 & 8, KOLKATA - 700 001

PHONE : 2235-5210, 2235-2109, FAX : 91-33-2225-3373

e-mail : sntescal@yahoo.com, SMART - 2386

দেশকে আজও হিন্দুদের দেশ বলতে অক্ষম। যদি ভারত ঘোষিত হিন্দুরাষ্ট্র হতো তাহলে কি আর হিন্দু বাঙ্গালিকে এই অপমানকর নাগরিকীকরণের প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে দিয়ে যেতে হতো? হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে একজন হিন্দুকে তার হিন্দুত্ব প্রমাণ করতে হবে, প্রমাণ দাখিল করতে হবে যে হিন্দু হওয়ার কারণে তাকে প্রতিবেশী দেশে সর্বস্ব খুইয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে, হিন্দুস্থানে মাথা গুঁজতে পারার জন্য একজন হিন্দুকে সরকার, কোর্ট, পুলিশের দোরে দোরে ঠোক্কর খেতে হবে, এগুলো কি মেনে নেওয়া যায়, না মেনে নেওয়া উচিত?

অনেকেই ভারতীয়ত্বের কথা বলেন এবং হিন্দুত্ব আর ভারতীয়ত্বকে এক করে দেখাতে চান। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা পরিচয়, প্রথমটি সাংস্কৃতিক এবং দ্বিতীয়টি ভৌগোলিক। আমাদের প্রাথমিক পরিচয় আমরা হিন্দু, অর্থাৎ যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে জীবনশৈলী ও সামাজিক মূল্যবোধ এই ভারতভূমিতে গড়ে উঠেছে, উত্তরাধিকারসূত্রে সেই শৈলী ও বোধের আমরা ধারক এবং বাহক। লক্ষ্য করে দেখবেন যে কোনো পরিবারের প্রতিটি সদস্য আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সমষ্টিগতভাবে প্রত্যেকটি পরিবারের একটি নিজস্বতা থাকে। কেউ বেশি ঝাল খান, কারো পড়াশুনার প্রতি দুর্বলতা থাকে, কেউ গানবাজনার প্রতি আকৃষ্ট হন, কেউ সরকারি চাকরিকে প্রাধান্য দেন, কেউবা বংশানুক্রমিকভাবে কৃষিকাজ বা হস্তশিল্পে পারদর্শী হন ইত্যাদি। প্রতিটি পরিবারের সকলের নাম যার যার হলেও পদবি কিন্তু সবার এক। ঠিক তেমনিই, আমাদের দেশীয় পরিচয় আমরা হিন্দু, তারপর কোনো অঞ্চলে বাস করি বা কী খাই বা কী পরি ইত্যাদি সব ব্যক্তিগত পরিচয়। বিড়ম্বনা হলো, আজ সমস্ত হিন্দুকে তার নিজস্ব দেশের সরকার স্বাভাবিক নাগরিক বলে মানছে না, সংস্কৃতি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ভৌগোলিক পরিচয়ের প্রমাণ চাইছে। সে অধিকার কী আদৌ হিন্দুস্থানের সরকারের থাকা উচিত?

আমি জাতীয় নাগরিকপঞ্জি চাই, কিন্তু নাগরিকত্ব যাচাইয়ের প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্টভাবে কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্য চাই। ব্রিটিশদের কবজায় থাকা প্রাচীন হিন্দুভূমি ভারতবর্ষ কেবলমাত্র বিজাতীয় মুসলমানদের পন্থভিত্তিক রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের তাগিদে ভাগ করা হয়েছিল, অন্য কোনো কারণে নয়। ভারত ভাগ হয়ে প্রথমে একটি ইসলামিক দেশ তৈরি হয় যাতে ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানরা ভারতীয় হিন্দুদের থেকে আলাদা থাকতে পারেন, পরে সেই অংশদুটি দুটি পৃথক ইসলামিক দেশে পরিণত হয়। সেই সময়ে পাকিস্তানের পথে ধাবমান অবিভক্ত বঙ্গকে ভাগ করে হিন্দু বাঙ্গালির একমাত্র বাসভূমি হিসেবে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শেষ মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গকে জিন্নার মুখ থেকে ছিনিয়ে আনেন, সে বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। হিন্দু বাঙ্গালির বাসভূমি মানে, যে হিন্দু বাঙ্গালি পাকিস্তানের বিজাতীয় গোঁড়া ইসলামিক শাসনকে মেনে নিয়ে মুসলমানদের অত্যাচার ও কটূক্তি সহ্য করে নিজের সংস্কৃতি পূর্ব পাকিস্তানে টিকিয়ে রাখতে পারবেন না, তাঁরা যেন স্বজাতীয় হিন্দু সংস্কৃতিমনস্ক ও সনাতন ধর্মানুসারীদের সঙ্গে একত্রে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারেন, সেই জন্যই পাকিস্তান ভাগ করে পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হয়েছিল। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা হিন্দু বাঙ্গালিদের জন্মগত অধিকার এই রাজ্যে বাসস্থান পাওয়া, এই সোজা কথাটা যেন আমরা কেউ কোনোদিন ভুলে না যাই। ভারতের অন্যান্য রাজ্য ভাষার ভিত্তিতে গঠিত হলেও আমাদের এই রাজ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং এবং নোয়াখালি হিন্দুহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র মুসলমানদের অত্যাচার থেকে হিন্দু বাঙ্গালিকে রক্ষা করার জন্য ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আজ কি আমরা শ্যামাপ্রসাদের সেই রাজ্যে হিন্দু বাঙ্গালির কাছে নতুন করে নাগরিকত্বের প্রমাণ চাইবো? কীসের লেগাসি ডাটা, কীসের সার্টিফিকেট? আমি একজন হিন্দু বাঙ্গালি এবং পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা, এটাই কী আমার যথেষ্ট পরিচয় ও নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়?

যাদের পন্থের ভিত্তিতে দেশভাগের তাড়নায় কয়েক কোটি হিন্দু বাঙ্গালি পরিবার তছনছ হয়ে গেছে, তারা বা তাদের একজনেরও বংশধর যেন আর আমাদের দেশে মিথ্যে ভারতীয় সেজে করেকম্মে খেতে না পারেন।

যদি নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হয়, তারা দেবেন যারা পন্থের ভিত্তিতে দেশভাগ করেছিলেন, তারা দেবেন যারা আমাদের বাপ-ঠাকুর্দার ভিটেমাটি থেকে আমাদের উৎখাত করে একবস্ত্রে প্রাণ হাতে করে পালিয়ে আসতে বাধ্য করেছিলেন, তারা দেবেন যারা দেশের জমি ভাগ করে নিয়েও আবার এপারে অনুপ্রবেশ করে আমাদের অংশে ভাগ বসাতে এসেছিলেন, আমরা কেন দেব? কোনো কাটঅফ এখানে চলবে না— যেদিন কোনো হিন্দু বাঙ্গালি পালিয়ে আসবেন, সেদিনই তিনি ভারতে আশ্রয় পাবেন এবং পরবর্তীকালে নাগরিকত্বও। হিন্দু বাঙ্গালির হিন্দু পরিচয়ই যথেষ্ট, তার কাছে কোনো লেগাসি ডাটা চাওয়া যাবে না। আর সবার আগে কঠোর পন্থ পরিবর্তন বিরোধী বিধি পাশ করাতে হবে যাতে ইচ্ছেমতো পন্থ পাল্টে কেউ হিন্দু বাঙ্গালি সেজে নাগরিকপঞ্জিতে নাম নথিভুক্ত করতে না পারেন। সবশেষে এটুকুই বলে ইতি টানবো যে, কোনো হিন্দু বাঙ্গালি যেন নিজভূমে অসম্মানিত না হন, সরকার সেই ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করুন। সেই সঙ্গে এটিও সুনিশ্চিত করুন যে যাদের পন্থের ভিত্তিতে দেশভাগের তাড়নায় কয়েক কোটি হিন্দু বাঙ্গালি পরিবার তছনছ হয়ে গেছে, তারা বা তাদের একজনেরও বংশধর যেন আর আমাদের দেশে মিথ্যে ভারতীয় সেজে করেকম্মে খেতে না পারেন। ■

শাসকদলের রাজনীতি আর প্রশাসনিক চাপে বাংলা সংবাদমাধ্যমগুলির নাভিশ্বাস

সুজিত রায়

রাজনৈতিক দল এবং রাজ্য প্রশাসনের অযৌক্তিক চাপের কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়ে সরকার বিরোধী সমস্ত খবর চেপে রেখে, শুধুমাত্র সরকারি বিজ্ঞাপন ছেপে যে খবরের কাগজ চালানো যায় না, তা আজ বাংলা খবরের কাগজগুলির ভয়াবহ পরিস্থিতি প্রমাণ করে দিচ্ছে। গত বছর দশেকের মধ্যে বাংলা সংবাদপত্র জগতে মুকুটহীন সম্রাট আনন্দবাজার গোষ্ঠী দফায় দফায় প্রায় ৮০০ কর্মীকে ছাঁটাই করেছে। যদিও আইনি পরিভাষায় তাকে ছাঁটাই বলা যাবে না। ব্যাখ্যায় পরে আসছি। সম্প্রতি সংবাদ প্রতিদিন গোষ্ঠী (বেসরকারি মতে) ৬০ জন কর্মচারীকে ছাঁটাই করেছে। শোনা যাচ্ছে, পুজোর পর আরও ৬০ জনকে ছাঁটাই করা হবে। বর্তমান বা আজকাল-এ এখনও পর্যন্ত ছাঁটাইয়ের কোনও খবর নেই। কিন্তু নতুন নিয়োগ প্রায় বন্ধ। আজকাল পত্রিকার সার্কুলেশন প্রতিদিন কমতে কমতে তলানিতে এসে ঠেকেছে। মালিকপক্ষ নাকি ঘনিষ্ঠমহলে বলতে শুরু করেছেন, এবার নতুন বিনিয়োগ বন্ধ করতে হবে। অত্যন্ত ছোটো মাপের দৈনিক, যেগুলি বাজারে দেখাই যায় না, যেমন সুপ্রভাত, সংবাদ নজর, দিন-দর্পণ, কলম ইত্যাদি সংবাদপত্রগুলির খবর বাজারে আসে না। কারণ এগুলির মালিকানা, দৈনন্দিন পরিচালনা, আর্থিক বিনিয়োগ ইত্যাদি নিয়ে স্পষ্ট ধারণা কে দিতে পারবে, কেউ জানে না। তবে এসব সংবাদপত্রে যাঁরা কাজ করছেন বা করেছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা ভালো নয়। বহু বছর আগে যুগান্তর, অমৃতবাজার গোষ্ঠী এবং বসুমতীর কী ভয়াবহ পরিস্থিতি হয়েছিল এবং ওই সমস্ত সংবাদপত্রের কর্মচারীরা কোন চরম দুর্দশায় দিন কাটিয়েছেন, কীভাবে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন, সে তথ্য কারও অজানা নয়। যদিও যুগান্তর গোষ্ঠী বা বসুমতী বন্ধ হওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ ছিল ঘরের সম্পদ ঘরের মানুষের হাতেই চুরি হওয়া নিয়ে।

কিন্তু ২০১১ সালের পর থেকে বাংলা সংবাদপত্রের জগৎটা রাতারাতি এক বিরাট প্রশ্নের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক এবং সরকারি চাপের নিষ্পেশনে সংবাদপত্রগুলির নাভিশ্বাস উঠে গেছে। এবং তার কোপ পড়ছে প্রাথমিকভাবে সাংবাদিক ও অসাংবাদিক কর্মচারীদের ওপরই সবচেয়ে বেশি।

২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিবর্তনকামী সরকার ক্ষমতায় আসার দিন কয়েকের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, কোন কোন সংবাদপত্র বা টেলিভিশন চ্যানেল সরকারি বিজ্ঞাপন পাবে। যেসব সংবাদপত্র বা টেলিভিশন চ্যানেলকে তিনি গুরুত্ব দিলেন, বিস্ময়করভাবে সেই তালিকায় বড়ো সংবাদপত্র বা টেলিভিশন চ্যানেলগুলির নাম ছিল না। সর্বাগ্রে তিনি যে নামগুলি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন সেগুলির মালিকানা ছিল হয় কোনও চিট ফান্ডের হাতে, নয়তো কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত নেতার হাতে। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী তখনই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, সরকারি বিজ্ঞাপন পেতে হলে স্পষ্ট কথা লিখলে চলবে না। যারা সরকারের পক্ষে লিখবে, যারা সরকারের কথায় কান ধরে ওঠবোস করবে, 'খবর' ছাপবে না, চাপবে, বিজ্ঞাপন পাবে তারাই। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তো আখের গোছানোর জন্য অনেক অগে থেকেই মমতাপন্থী ভেক ধরে বসেই ছিল। চিট ফান্ড পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি তো মমতা ভজনাকেই 'সংবাদ' বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে তাঁরা 'সংবাদ' শব্দটির গুণগত মান শ্মশানে পাঠিয়ে সরকারি বিজ্ঞাপনের দখল পেয়ে গেল সহজেই। বাকিরা? নতুন খেলা শুরু হলো। আনন্দবাজার গোষ্ঠীর বরাবরের নীতি ছিল— সংবাদ হবে সরকার বিরোধী। কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দল বিরোধী নয়। আনন্দবাজার গোষ্ঠীর টেলিভিশন চ্যানেল এ বি পি আনন্দও সেই নীতিই অনুসরণ করত। কিন্তু মমতার এই অদৃষ্টপূর্ব রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সরকারি ঘোষণায় আনন্দবাজার রাতারাতি দীর্ঘদিনের সরকার বিরোধিতার ঐতিহ্য জলাঞ্জলি দিয়ে সরকারের তাঁবেদার হয়ে গেল। আজকাল ছিল পুরোপুরি বামপন্থী ঘরানার কাগজ। ওই কাগজটির সম্পাদক অশোক দাশগুপ্ত চিরকাল গাড়ির পিছনের আসনে বাঁদিক ছাড়া ডানদিকে বসতেন না এবং হেসে বলতেন— 'I am always left।' তিনি রাতারাতি ডানপন্থী হয়ে গেলেন। তাঁর তরুণ বয়সের অতি বামপন্থী ইমেজ, পুরনো সংবাদকর্মীদের এতদিন ধরে পোষণ করে আসা একটা বামপন্থী ঘরানাকে চিহ্নিত করে। প্রকাশ্যে ঘোষণা না করলেও 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' বলে তিনিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'প্রকৃত বামপন্থী' বলে মেনে নিয়ে আজকাল-কে বিকিয়ে দিলেন 'বুর্জোয়া' শাসকগোষ্ঠীর হাতে। জোর গলায় বলার আর কোনও ক্ষমতাই রইল না— শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই। বর্তমান পত্রিকা ভগবান ছাড়া কাউকে ভয় পেত না। অন্তত বরেণ্য প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথিতযশা সংবাদকর্মী-কাম-সম্পাদক বরুণ সেনগুপ্তের আমলে ওই তত্ত্বই মেনে চলার চেষ্টা হয়েছে। বরুণবাবুর মৃত্যুর পর ভগবান লোপাট। 'ভগবান ছাড়া কাউকে ভয় পায় না' লেখা হোর্ডিংগুলো রাতারাতি লোপাট হয়ে গেল। সম্পাদকের কলম থেকে গলে গলে পড়তে শুরু করল মমতা-প্রশস্তি। বহু ইংরেজি সংবাদপত্রও রাতারাতি তাদের সর্বভারতীয় পরিচয় মুছে ফেলার চেষ্টায় মেতে উঠল। এবং অলিখিতভাবেই গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে মিডিয়া রাজত্বে জন্ম নিল এক নতুন যুগ— সরকারি ভজনা। এবং তা সরাসরি মালিকপক্ষের তত্ত্বাবধানে। সিদ্ধান্ত হয়ে গেল, মুখ্যমন্ত্রী যা বলবেন— সংবাদপত্রের নীতি নির্ধারণ হবে সেভাবেই। এমনকী বেশ কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেলে সম্পাদক বা সমমর্যাদার পদে বসে গেলেন মুখ্যমন্ত্রীর বশংবদ কিছু সাংবাদিক যাঁরা এতদিন বাংলা সাংবাদিকতায় হালে পানি পাননি। লাখো লাখো টাকা, গাড়ি, বাড়ি, সরকারি কমিটির চেয়ারম্যান, সদস্যপদ— সব মিলে গেল লটারি পাওয়ার মতো। শর্ত একটাই— সকাল বিকেলে মমতার পায়ের ধুলো নিতে হবে। এদিক ওদিক হলেই খেতে হবে গোড়ালির ধাক্কা। নিখুঁত হিসেব। মালিকপক্ষের নির্দেশে সংবাদকর্মীরা 'খবর' লেখা বন্ধ করতে বাধ্য হলো। তাদের বলা হলো— 'খবর' চাপো। মাইনে নাও। সাংবাদিকদের জাত কেড়ে নিল মালিকপক্ষ। সরকারের বিরুদ্ধে কিছু খবর 'খবর' হবে না। সংখ্যালঘুদের অত্যাচার 'খবর' হবে না। 'মুখ্যমন্ত্রী যাহা বলিবেন তাহাই বেদবাক্য' কারণ সরকারি বিজ্ঞাপন ছাড়া সংবাদপত্রের নাকি শ্বাসকষ্ট হবে। ফল যা হবার হলো— প্রতিটি সংবাদপত্র যতই গালভরা হিসেব দিক না কেন, বাজারে কাগজের হকারদের কাছে খোঁজ নিলেই যে

সত্যটা বেরিয়ে আসে তা হলো— সব কাগজ গ্রাহক হারাচ্ছে। পাঠক হারাচ্ছে। আনন্দবাজারের সার্কুলেশন বিভাগের কর্মচারীরা গ্রাহকদের ফোন করে গ্রাহকপদ রিনিউ করার আবদেন জানালে গালাগাল ছাড়া আর কিছু শুনতে পান না। বহু সংবাদপত্রের সৎ ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকরা চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে আসছে বা অন্য চাকরিতে যোগ দিচ্ছে। কারণ চাকরিটাই অভিশপ্ত হয়ে উঠেছে। কখন কার ঘাড়ে কোপ পড়বে কেউ জানে না। আনন্দবাজার গর্ব করে বলে, আমরা কাউকে ছাঁটাই করিনি। আইনত কথাটা ঠিক। কারণ তাঁরা যেটি বলেন না, তা হলো 'স্বেচ্ছায়' পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে শ'য়ে শ'য়ে কর্মচারীকে। না করলে বদলি করা হয়েছে নির্বাসনের মতো এমন জায়গায় যেখানে খবর হয় না। তারাও বাধ্য হচ্ছেন চাকরি ছাড়তে। অন্য সংস্থাগুলো তো স্বেচ্ছাবসর প্রকল্প বলে কিছু হতে পারে বলেই মানছেন না। মাস তিনেকের মাইনে হাতে গুঁজে দিয়ে বলছে— বিদেয় হও। অথচ জনদরদি সততার প্রতিমূর্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি ২০১১-র ভোটের আগে জেসপ বা ডানলপের অত্যাচারিত শ্রমিকদের জন্য পথে নেমেছিলেন, কিন্তু সাংবাদিক ও অসাংবাদিক কর্মীদের জন্য কুমিরের কান্নাও কাঁদেন না। পথে নামা তো দূর অস্ত।

অস্বীকার করা যাবে না, সংবাদপত্রগুলির কাহিল অবস্থার জন্য আরও অনেক কারণ আছে। নানা কারণে অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছে সংবাদ সংস্থাগুলি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এ অবস্থার জন্য যে রাজ্য প্রশাসক এবং শাসকদলের চাপের রাজনীতিই দায়ী, তা মুখে না বললেও মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য সংবাদপত্র পচিালন গোষ্ঠীগুলি। আজ যারা এখনও বিভিন্ন বাংলা সংবাদপত্রে বা টিভি চ্যানেলে কাজ করছেন— তারা অনেকেই প্রকাশ্যে বলে বেড়ান; সাংবাদিক নামে ডেকো না। লজ্জা হয় পরিচয় দিতে। শুধু নির্লজ্জের মতো ঘুরে বেড়ায় সেইসব সাংবাদিকরা যারা বাংলা সাংবাদিকতার মানসম্মানকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে কোটি কোটি টাকার তখতে বসে আছেন। নির্লজ্জের মতো ঘুরে বেড়ান সেই সব সাংবাদিক কর্মচারী ইউনিয়নগুলির নেতৃবৃন্দ যাঁদের চোখের সামনে সাংবাদিকরা চোখের জল ফেলতে ফেলতে রাস্তায় এসে দাঁড়ান আর সেই জল মাড়িয়ে নতুন বিলাসবহুল গাড়ি চেপে অফিসে ঢোকেন নিজেরাই আর অবসরের পরও আজীবন চাকরির প্রতিশ্রুতি পেয়ে যান মালিকপক্ষের কাছ থেকে। এ বড়ো দুঃসময়। বাংলা সাংবাদিকতায় এহেন দুর্গতির কথা কী কখনও ভেবেছিলেন হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিনাথ দে, শিশির কুমার ঘোষ, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ চৌধুরীরা। বছর দশেক আগেও যারা চুটিয়ে সাংবাদিকতা করেছেন হাড় মাস কালি করে তাঁরাও কখনও ভেবেছেন— খবর লিখতে পারবেন না। সরকারি মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করবেন?

কবির ভাষাতেই তাই বেরিয়ে আসে বুকফাটা আর্তনাদ— 'এ মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়।' এ সংবাদজগৎটা আমার চেনা নয়। এ জগৎ আমার কাছে আগন্তুক, অনাহূত। এ জগৎ মুছে যাক। এ জগতের মৃত্যু ঘটুক এবং তা যত শীঘ্র সম্ভব।

এখনও যাঁরা সাংবাদিকতা করছেন— তাঁরা ভাবুন— ফেসবুকে তৃণমূল তথা মুখ্যমন্ত্রীর তাঁবেদারি করে নবান্নের একটি চেয়ার দখল করবেন নাকি বাংলা সাংবাদিকতার ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে প্রতিবাদে শামিল হবেন? কারণ, আপনি চাকরি হারাচ্ছেন আপনার দোষে নয়। মালিকপক্ষের অপদার্থতায় আর সরকার ও শাসকদলের বেআব্রু রাজনৈতিক পদক্ষেপে। তার দায়ে আপনি মাথা পেতে নেবেন কেন?

দেশ যখন এক নতুন যুগে পা রাখতে চলেছে, তখন এই বাঙ্গলায় ইতিহাস উল্টো পথে হাঁটবে কেন? কীসের তাগিদে? কোন অপরাধে? আজকের বাঙ্গলা তো আমার আপনার সেই সুজলা সুফলা জন্মভূমি নয়। তোষণ, শোষণ, হুমকি, অপশাসনের এক বন্ধ্যাদেশ। এই বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে সূর্যকরোজ্জ্বল বাঙ্গলা গড়ার দায় নিতে হবে সাংবাদিকদেরই। যে কোনও মূল্যে। যে কোনো আত্মত্যাগের বিনিময়ে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে আজই— মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে নাকি বিকিয়ে দেব মাথাটা চরমতম অপশাসকের বেআব্রু রাজনীতির কাছে। ■

With Best Compliments from-

TANTIA CONSTRUCTIONS LTD.

Registered & Corporate Office

DD-30, Sector -I,
Salt Lake City, 7th Floor
Kolkata - 700 064
Tel. : +91 33 4019 0000
Fax : +91 33 4019 0001

Delhi Office :

112, Uday Park, 2nd Floor
August Kranti Marg
New Delhi - 110049
Tel. : 011-40581302

With Best Compliments from-

LEELADHAR PODDAR

8, Ho Chi Minh Sarani

Harington Mansion

3rd Floor, Room No 28/4

West Wing

Kolkata - 700 071

Harry & Co. Trading (Kolhapur) Pvt. Ltd.

Phone : 2235-3641, 2235-6483

54, Ezra Street, Block D-2
1st Floor
Kolkata - 700 001

With Best Compliments From :-

Shree Enterprises (Coal Sales) Pvt. Ltd.

Coal Merchants & Commission Agents

32, Ezra Street, Room No. 854,
Kolkata - 700 001
Phone (O) 2235-0277, 9934

SUPERSPEED CARRIERS PRIVATE LIMITED

2 Roopchand Roy Street, 3rd Floor, Room No. 309, Kolkata - 700 007
Phone : 32476907, Telefax : 2270 1163, Mobile : 98302 76002 E-mail : superspeed@dataone.in

শুভ দীপাবলীর শুভেচ্ছা সহ—

উমেশ গোয়েঙ্কা

নিয়ামতপুর, পো ঃ সীতারামপুর, জেলা - বর্ধমান

পূজা ও দীপাবলীর অভিনন্দন গ্রহণ করুন —

Shree Nursing Electric Stores

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

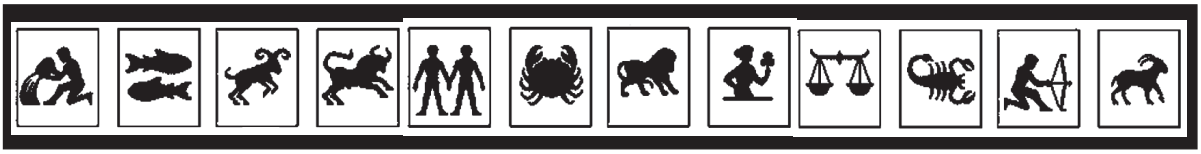

২১ অক্টোবর (সোমবার) থেকে ২৭ অক্টোবর (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রাহু, কন্যায় মঙ্গল, তুলায় রবি-শুক্র, বৃশ্চিকে বুধ বৃহস্পতি, ধনুতে শনি, কেতু। ২৯-১০ মঙ্গলবার, রাত্রি ১টা ১০ মিনিটে শুক্রের বৃশ্চিকে প্রবেশ। ১ নভেম্বর শুক্রবার বুধ বক্রীরূপ পরিগ্রহ করছে। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র তুলায় স্বাতী নক্ষত্র থেকে মকরে উত্তরষাঢ়া নক্ষত্রে।

মেষ : যুবক-যুবতীদের নতুন যোগাযোগ। প্রিয়জনের জন্য ব্যাকুল। অর্থ সংগ্রহে হিমশিম অবস্থা। স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তায় কর্মে প্রশংসা। নতুন ব্যবসায় বিনিয়োগ বিত্ত ও আভিজাত্য বৃদ্ধি। সপ্তাহের শেষভাগে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে ক্ষতি এবং প্রতারকের ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনা। রমণীর মোহময় দৃষ্টিতে প্রলুব্ধ হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা।

বৃষ : গীত উৎসবে আত্মীয়-বন্ধু সমাগম, হৃত গৌরব লাভ। পুত্র কল্যাণে বৈভব সৎকীর্তি, গৃহ ও মাতৃসুখ, তবে কর্মক্ষেত্রে তুচ্ছ কারণে মনান্তর ও ভাগ্যবিড়ম্বনা। বিদ্যার্থীদের জটিলতাপূর্ণ পরিবেশ, সন্তানের প্রতিষ্ঠা, অগ্রজের কর্মে অগ্রগতি, পাবিারিক কষ্ট লাঘব, মিত্রস্থান হিতকারী।

মিথুন : শিল্পী, কলাকুশলীদের প্রতিভার ব্যাপ্তি, অনুষ্ঠানে ব্যস্ততা ও শংসা। বিদ্যার্থীদের চটুল ম্যাগাজিন, ফেসবুকে আসক্তি, সহানুভূতিপ্রবণ মন। কর্মপ্রার্থীদের আত্মপ্রতিষ্ঠা গুরুজনের আশীর্বাদ প্রাপ্তি। বিশেষ উদ্দেশ্য রূপায়ণে প্রতিবেশীর প্ররোচনা প্রত্যাখ্যান করুন।

কর্কট : অংশীদারি ব্যবসা ও বাহন ক্রয়ে অন্যের পরামর্শ এড়িয়ে চলুন। ক্রোধ সংবরণ করুন। অধীনস্থ ব্যক্তির কথা সহ্য করতে হবে— যা আশাভঙ্গের কারণ। পারিবারিক শান্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়। ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, খনিজ, ঔষুধ ও মাদক ব্যবসায়ীর বিত্ত ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি।

সিংহ : পারিবারিক অসুস্থতায় উদ্বেগ, নতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও ক্রয়-বিক্রয় স্থগিত রাখা শ্রেয়। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে গুরুত্ব দিন। প্রেমজ ব্যাপারে নতুন যোগাযোগ ও উৎসাহ বৃদ্ধি। সৃষ্টিধর্মী ও সমাজ সেবায় গুণীজন সান্নিধ্য ও মানবিক গুণের প্রকাশ। সন্তানের চঞ্চল মানসিকতায় ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা।

কন্যা : দাঁতের ব্যথা ও জননেন্দ্রিয়ের সমস্যা, শত্রুর দ্বারা ক্ষতি, কলহ-বিবাদে বিষণ্ণতা। কর্মক্ষেত্রে কুহকিনীর হাতছানিতে আবেগ সংবরণ করুন। অন্যথায় আইনি জটিলতা গ্রাস করতে পারে। গৃহনির্মাণ বিষয়ে প্রতিবেশীর সহযোগিতা লাভ। পারিবারিক দায়িত্ব পালন ও সন্তান-সন্ততির প্রয়োজনে অপ্রত্যাশিত ব্যয়।

তুলা : টিভি, ফিল্ম, নৃত্যশিল্পী ও সংগীত ব্যক্তিত্বদের সৃষ্টিশীলতার বহুমুখী প্রকাশে জগতের আনন্দযজ্ঞে সক্রিয়তায় প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা, হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে সমাজের রসাস্বাদন। ব্যবসায় অসতর্কতায় অর্থ দণ্ড, কর্তৃপক্ষের সুনজরে থাকায় আসন বদল, আর্থিক উন্নতি। সন্তানের বাজারমুখী শিক্ষায় প্রবণতা ও মননে আধুনিকতার পরশ।

বৃশ্চিক : পারিবারিক পরিবেশ ও মাতার স্বাস্থ্য বিষয়ক উদ্বেগ। ভ্রমণে সাবধানতা। স্বামী-স্ত্রীর ভুল বোঝাবুঝি ও মহিলার ষড়যন্ত্রে আর্থিক ক্ষতি ও সম্মান হানি। সপ্তাহের শেষভাগে মাতুলালয় থেকে বাড়ি-ঘর, সম্পত্তি প্রাপ্তি যোগ। সন্তানের অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষায় হতাশা, তবে ভ্রাতা বা ভগিনীর কোনো সুখবর আনন্দের।

ধনু : ভোজনে তৃপ্তি, বাহন যোগ, বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত চিন্তার বাস্তবায়ন, সৃজনশীল কর্মে উৎসাহ, উচ্চশিক্ষায় দূর গমন। একাধিক পন্থায় আয়ের নতুন দিগদর্শন। আপনজনের অসংগতিপূর্ণ ব্যবহারে ব্যথিত বোধ। কারিগরি কুশলতায় কর্তৃপক্ষের শংসা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি। কথাবার্তা ও চলাফেরায় সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।

মকর : দালালি, প্রমোটিং, ফাটকায় শুভ। অগ্রজের পদোন্নতি পরিবারে সদস্য বৃদ্ধির যোগ, পুলিশি অথবা আইনি ঝামেলা বিষয়ে সতর্ক থাকুন। দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয়ের পরিকল্পনা সফল হবে। যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যে শংসা। সমাজ সেবামূলক কর্ম, দান-ধ্যানে মননশীলতার প্রকাশ। বাত, রক্তচাপ, পতনজনিত আঘাতে সতর্কতা।

কুম্ভ : পারিবারিক অসুস্থতা ও ব্যয়বাহুল্যের চাপ, কথাবার্তায় অসংলগ্ন ভাব, অনিদ্রা, দুশ্চিন্তা, ভৃত্য বিবাদ, গোপন শত্রুতা, দাম্পত্য সম্পর্কে জটিলতা। আবেগ প্রবণতায় সৌভাগ্যের প্রশস্ততায় রাহুর গ্রাস। পুরানো চোটাঘাতে শারীরিক ক্লেশ, প্রভাবশালী ব্যক্তির সান্নিধ্যে শান্ত-সংযত থেকে কৌশলী মনোভাব শ্রেয়।

মীন : মানসিক অস্থিরতায় কর্মক্ষেত্রে সমস্যা। পেশাদারদের ব্যস্ততা। বিলাস ব্যসনে ঋণ। বাসনার অপূর্তি, বিদ্যার্থীদের উচ্চাশিক্ষা, জ্ঞানান্বেষণ। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আরও মনোসংযোগ ও স্থিরচিত্তে অগ্রসর হতে হবে অন্যথায় প্রতিভার স্বাভাবিক বিচ্ছুরণে প্রতিবন্ধকতা, রমণী নৈকট্যে জীবিকার্জনে অনিশ্চয়তা।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য

With Best Compliments From :-

EAST INDIA TRANSPORT AGENCY

(A Unit of E.I.T.A. India Limited)

20B, Abdul Hamid Street
4th Foor
Kolkata - 700 069
Phone : Nos. 22483203
Fax No. 22483195
Email : eita.cal@eitain.com

With Best Compliments from :

Singhania & Co.

7B, Kiransankar Roy Road
2nd Floor, Kolkata - 1

With Best Compliments from :

A Well Wisher

(A.T.)